ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন-এর প্রয়াণ বার্ষিকী স্মরণে
যুক্ত রয়েছে বিশেষ ক্রোড়পত্র

নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

২০২০ সাল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শুরু করেছিল বছরব্যাপী নানা আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে, এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ঘিরে বিশেষ পরিকল্পনা। মার্চ মাসের সূচনায় বাংলাদেশে বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংক্রমণের ফলে জননিরাপত্তায় সুরক্ষাবিধি মেনে বন্ধ হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা। তবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সবসময়েই গতানুগতিকতার বাইরে বের হয়ে কাজ করে, কাজেই খুব দ্রুত এই দুর্যোগকালকে সম্ভবনাময়কাল হিসেবে পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট হয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এবং স্বকীয়তা বজায়ে রেখে জনগণের সঙ্গে সংযোগ অটুট রাখবার লক্ষে অনলাইন কার্যক্রম নিয়ে এক ভিন্ন মাত্রার যাত্রা শুরু করে। আমরা আনন্দের সাথে জানাতে চাই বিগত ৮ মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জনগণের সঙ্গে আরো নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলেছে। মুজিব জন্মশতবর্ষের পরিকল্পনায় আনা হয় ব্যাতিক্রমী পরিবর্তন। আর্কাইভস ও ডিসপ্লে টিমের তৎপরতায় বঙ্গবন্ধু ও ৬ ছয় দফার সংগ্রাম তুলে ধরে দেশের প্রথম অনলাইন প্রদর্শনী তৈরি হয়। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এই ডিজিটাল প্রদর্শনী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করেছে। এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিশেষ দিক তুলে ধরে আরো দু'টি অনলাইন প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। ৩০ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট, অনলাইনে আয়োজন করা হয় বঙ্গবন্ধুর স্মরণে তিনটি স্মারক বক্তৃতা। নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার, এতে যুক্ত হচ্ছেন খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক গবেষকবৃন্দ। তাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হচ্ছেন এদেশের তরুণ প্রজন্ম। আয়োজিত হয় রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রামাণ্যচিত্র 'A Mandalin in Exile'-এর প্রদর্শনী, রোহিঙ্গা শরণার্থী নারীদের শিল্পকর্ম নিয়ে ডিজিটাল প্রদর্শনী 'Thread Exhibition'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্র আয়োজন করে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসব, এতে ৫০টি দেশের ৮২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। গবেষকদের জন্য আয়োজিত হয়েছে দু'টি মাসব্যাপী সার্টিফিকেট কোর্স। শিক্ষকদের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে জুম প্লাটফর্মে শিক্ষক সম্মিলনীর মাধ্যমে। জনগণের প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার মূল শক্তি জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই জাদুঘর বার্তার মাধ্যমেও। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার সুহৃদদের সহযোগিতায় পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কাজে এগিয়ে যাবে এবং যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, এ আশাবাদ আমাদের রয়েছে।

করোনাকালে ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগের সংযোজন ভার্চুয়াল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আমেনা খাতুন

মার্চ ২০২০-এ লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ -জাদুঘরের কর্মসূচি নব উপায়ে পালনের পরিকল্পনা করা হয়। এই লক্ষ্যে চলছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। তবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাংগনে নয়, অনলাইন কেন্দ্র করে। জুন মাসে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দিবস কেন্দ্র করে অনলাইন প্রদর্শনীর মাধ্যমে এর শুরু। চলছে সভা, কর্মশালা, বক্তৃতা, স্মরণানুষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন-এর পাশাপাশি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীসহ নানা আয়োজন। এছাড়াও চলছে মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদানের কাজ। আরেকটি বড় কাজ চলমান রয়েছে যা বিজয়ের মাস ডিসেম্বর নাগাদ সম্পন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে 'আর্কাইভ ও ডিসপ্লে টিম'। দর্শকদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে ট্রাস্টিরা বৈঠক করেন ২৮ আগস্ট ২০২০। সভায় দ্রুততম সময়ে ভার্চুয়াল মিউজিয়াম ট্যুর এর কর্মসূচি হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 'অলীক' ডিজিটাল প্রতিষ্ঠানকে ভার্চুয়াল শুটিং এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 'আর্কাইভ ও ডিসপ্লে টিম' সেপ্টেম্বর-এ শুরু করে ভিডিও ধারণের জোরদার প্রস্তুতি। প্রয়োজন-মাফিক নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় কিছু প্রদর্শনী, পরিচ্ছন্ন করা হয় গোটা গ্যালারি ও সজ্জা। সমস্ত আয়োজন শেষে অক্টোবরের শেষে ভিডিও ধারণ সম্পন্ন করে পাঠিয়ে দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট ভার্চুয়াল ট্যুর কোম্পানির সার্ভার স্টেশনে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচারের বহু মাত্রিকতার দরুণ তা সময় সাপেক্ষ বলে এখনও প্রসেসিং পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় দ্রুতই তা সম্পন্ন হবে। 'ভার্চুয়াল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'টি বিজয়ের মাসে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করার জোর চেষ্টা চলছে।

ভার্চুয়াল ট্যুর প্রস্তুতের জন্য ৩৬০° ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ চলছে

এছাড়া বহুমাত্রিক-ভার্চুয়াল অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্ব-মহিমায় নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের নানা চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাসিক মুখপত্র 'মুক্তিযুদ্ধ জাদঘর বার্তা'-এ একাত্তরের নভেম্বর মাসে ক'জন আত্মদানকারী শহীদের ত্যাগের ঘটনা তুলে ধরা হলো। চেষ্টা রয়েছে গ্যালারিতে প্রদর্শিত ঘটনার পাশাপাশি আর্কাইভে সংরক্ষিত স্মারকের (স্থানানাভাবে যেগুলো গ্যালারিতে প্রদর্শন সম্ভব হচ্ছে না) উপস্থাপনও অব্যাহত থাকবে।

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

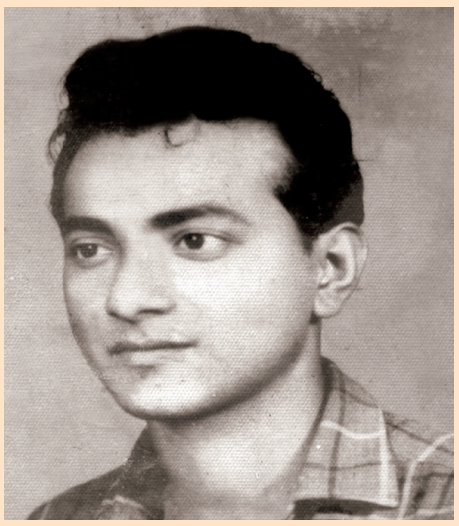

ডা. আজহারুল হক (১৯৪০-১৯৭১)

ডা. আজহারুল হক সিলেট মেডিক্যাল স্কুল থেকে ১৯৬৭ সালে এলএমএফ ডিগ্রি এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি গোপনে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন। তাঁর এই কর্মকাণ্ডের কথা আল-বদররা জেনে ফেলে এবং হুমকি দিয়ে পত্র দেয়। ১৫ নভেম্বর তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত তাঁর মরদেহ নটরডেম কলেজের কাছে কালভার্টের উপর পাওয়া যায়।

দাতা: সৈয়দা সালমা হক

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা
কাজী মো. মঞ্জুর হোসেন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের ছাত্র কাজী মো. মঞ্জুর হোসেন মেলাঘর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আগস্ট মাসে দেশে ফিরে ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। ৭ নভেম্বর আড়াইহাজার থানার বাগদি নামক স্থানে পাকসেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার সন্তান।

দাতা: আম্বিয়াতেন নেসা

জগৎজ্যোতি দাস বীরবিক্রম (১৯৪৯ - ১৯৭১)
সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্র জগৎজ্যোতি দাস মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেন। ১৬ নভেম্বর ১৯৭১ শত্রু দ্বারা ঘেরাও হয়েও তিনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা বীরের মতো লড়াই করে চলেন। শেষ গুলিটি সম্বল থাকা পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ করেন। পাকবাহিনী জগৎজ্যোতিকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে আজমিরিগঞ্জ বাজারে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে এমনিভাবে বেঁধে রেখেছিল। পরে তাঁর লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয় কুশিয়ারার জলে।
তথ্যসূত্র: সালেহ চৌধুরী, 'ভাটি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার' অন্যপ্রকাশ, ২০১৭

দাতা: অঞ্জলি লাহিড়ী

শ্রদ্ধাঞ্জলি : রশীদ হায়দার ও আমীর আহম্মেদ চৌধুরী

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হারিয়েছেন দু'জন সুহৃদ। তাঁদের প্রয়াণে আমরা শোকাহত। যে আদর্শ ও মূল্যবোধ ধারণ করে তাঁরা তাদের জীবনকর্মে অবদান রেখেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি তাদের শুভকামনা সবসময়ে জাদুঘরের সাথে থাকবে।

রশীদ হায়দার সর্বাধিক পরিচিত সাহিত্যিক হিসেবে। গবেষক হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধকে। তার একনিষ্ঠ শ্রম দিয়ে তুলে এনেছেন বুদ্ধিজীবী শহীদ স্বজনের বেদনার কথা, যা লিপিবদ্ধ আছে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'স্মৃতি : ৭১' গ্রন্থমালায়। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করেছেন অসংখ্য গবেষণা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অকৃত্রিম সুহৃদ এই মানুষটি জাদুঘরের বিভিন্ন আয়োজনে সাথে থাকতেন। ছাত্রছাত্রীদের মিলনমেলা মুক্তির উৎসবে যেমন আসতেন তেমনি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের সাথেও দেশের অনেক অঞ্চলে গিয়েছেন শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে।

ময়মনসিংহের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মুক্তিযোদ্ধা আমীর আহম্মেদ চৌধুরী রতন। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ মুকুল ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা, ময়মনসিংহ মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের রেক্টর, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের জেলা আহবায়ক। এই আলোকিত মানুষটি আদর্শিক ও পারিবারিকভাবে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর ময়মনসিংহ জেলা পরিভ্রমণে তার আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারধারা

টিজেএএন-সিএসজিজে ওয়েবিনার : দ্বিতীয় পর্ব

২৩ অক্টোবর২০২০, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক (টিজেএএন)- এর যৌথ উদ্যোগে চলমান ওয়েবিনার সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এশীয় অঞ্চল জুড়ে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা প্রসারের লক্ষ্যে টিজেএএন এবং সিএসজিজে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরণকালীন বিচার কিংবা ট্রানজিশনাল জাস্টিস পদ্ধতির সাথে এশীয় অঞ্চলের সংশ্লিষ্টজনের পরিচয় সাধনই এই ওয়েবিনার সিরিজের মূল লক্ষ্য, যার ফলশ্রুতিতে, ট্রানজিশনাল জাস্টিসের মূল স্তম্ভগুলো কেন্দ্র করে ওয়েবিনার পরিচালিত হচ্ছে।

এবারের যৌথ ওয়েবিনারটির শিরোনাম ছিল, আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারধারা।ওয়েবিনারে কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশের তিনজন অতিথি বক্তা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আদালত ব্যাবস্থার বর্ণনা মেলে ধরেন। সিএসজিজের স্বেচ্ছাসেবী গবেষক হুমায়রা বিনতে ফারুক ওয়েবিনারটি সঞ্চালনার দায়ীত্ব পালন করেন।

প্রথম বক্তা হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাপস কুমার দাস বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি তথা সাতচল্লিশের দেশভাগ পরবর্তী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ইতিহাস নৃশংসতা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেন। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের আলোকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার ওপর জোর দেন। বাংলাদেশে স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নকালে তিনি বলেন, পাকিস্তানি অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা এখন ট্রাইব্যুনালের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ট্রাইব্যুনাল সকল শহীদ এবং জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি পরম পাওয়া।

কম্বোডিয়ান বক্তা শ্যাম্পো রোজ, ১৯৭৫-১৯৭৯ সময়কার কম্বোডিয়ার ঐতিহাসিক দলিলাদি সংকলনে তার পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরীণ আদালত ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কম্বোডিয়া সরকার প্রথম আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করলেও তার কার্যক্রম যথেষ্ট সন্তোষজনক ছিল না। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ইসিসিসি-এর কথা তার বক্তব্যে স্থান পায়। শ্যাম্পো রোজ বলেন, অভ্যন্তরীণ আদালতের সাথে জড়িত ব্যাক্তিবর্গ যদি ইসিসিসি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন তবে দেশের আইনী ব্যবস্থায় অনেকটা পরিবর্তন সাধন সম্ভব।

১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত জেনারেল সুহার্তোর সামরিক শাসনামলে ঘটে যাওয়া হত্যা, বিধিবহির্ভূত গ্রেফতার, ধর্মীয় ও বাকস্বাধীনতায় বাধাসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধের বর্ণনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়া ফার্নিদা তার বক্তব্য শুরু করেন। এ সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ আইনী ব্যবস্থা এবং মানবাধিকার আদালতের গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলেন, যদিও জাতিসংঘের চাপে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট অনেকটা বাধ্য হয়ে দেশটিতে আদালতটি স্থাপন করেন। একপর্যায়ে তিনি মানবাধিকার আদালতের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সামঞ্জস্যতার কথাও উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক তিমুর লেসতে-তে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের কথাও তাঁর বক্তব্যে স্থান পায়।

পরিশেষে দেশটির সুশীল সমাজের অবদান উল্লেখপূর্বক ইন্দ্রিয়া বলেন, তারা ঘোরতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভুক্তভোগীদের আইনের সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং অন্যান্য সাহায্য করে চলছেন।

ওয়েবিনার শেষে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল, যেখানে অংশগ্রহণকারী শ্রোতারা বক্তাদের সাথে সরাসরি কথোপকথনের সুযোগ পেয়েছিলেন। জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪৫জন অংশগ্রহণকারী ওয়েবিনারটিতে অংশ নেন। সফল এই ওয়েবিনারটি সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর পরিচালক মফিদুল হকের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয়।

১৯৭১-এর গণহত্যার তদন্ত ও বিচারে পাকিস্তানের বাধ্যবাধকতা

তাপস কুমার দাস

সহযোগী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তপাতের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানি সামরিক অভিযানে নয় মাসে কমবেশি ত্রিশ লক্ষ লোক নিহত ও চার লক্ষ নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যুদ্ধকালীন নৃশংসতা ও যুদ্ধরীতি লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার করা সংঘর্ষে লিপ্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধে সহযোগিতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিচারের সম্মুখীন করেছে, যে প্রক্রিয়া এখনও চলমান (১৯৭২-৭৩; ২০১০-চলমান)। কিন্তু, একাত্তরের নৃশংসতায় সম্পৃক্ত পাকিস্তানিদের বিচার এখনও উপেক্ষিত রয়েছে। এমতাবস্থায়, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ন্যায্য দাবি ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

দেশ ও কাল ভেদে আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় দায় সৃষ্টি করে। যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত পাকিস্তানি নাগরিকগণ অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে দায়মুক্তি ভোগ করলেও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের ফৌজদারী দায় অক্ষুন্ন রয়েছে।১৯৭১ সালের পূর্বেই পাকিস্তান Genocide Convention, Geneva Convention, UDHR, ICEARD এবং Hague Convention for the Protection of Cultural Property এর আইনগত বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যরূপে পাকিস্তান জাতি সংঘ সনদ সহ সকল আন্তর্জাতিক সনদের প্রতি দায়বদ্ধ। Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 এর ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা সমূহ মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৭০ সালে Viena Convention স্বাক্ষর করায় পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সনদের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল। পাকিস্তান স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ মৌলিক (substantive) ও পদ্ধতিগত (procedural) উভয় প্রকার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে। ফলে, মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও অভিযুক্ত নাগরিকদের ব্যক্তিগত এই উভয় প্রকার দায় সৃষ্টি করে।

Genocide Convention, Geneva Conventions, ICEARD এবং Hague Convention এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হয়েও পাকিস্তান এই সকল সনদে নিষিদ্ধ অপরাধ হতে নিজ বাহিনী ও নাগরিকদের বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়। সনদে বর্ণিত অপরাধ প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার জন্য পাকিস্তানকে মৌলিক আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করা যায়। অধিকন্তু, সংঘটিত অপরাধের অনুসন্ধান ও অপরাধীদের বিচার না করে পাকিস্তান স্বাক্ষরিত সনদের অধীনে পদ্ধতিগত

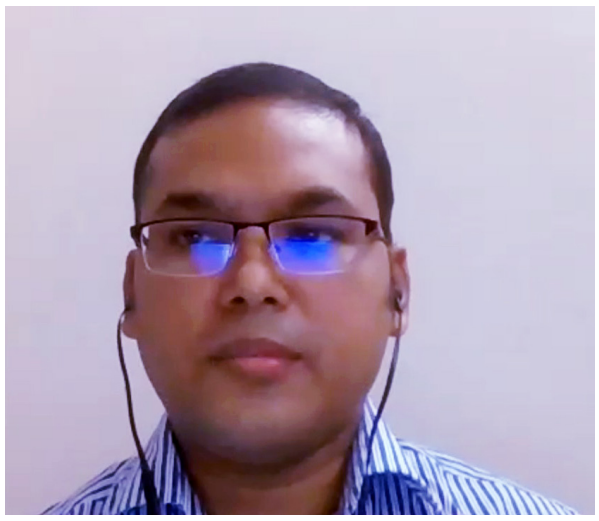

বাধ্যবাধকতাও লঙ্ঘন করেছে। আবার, সংঘর্ষকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধরীতি লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্ত ও বিচার প্রথাগত আন্তর্জাতিক যুদ্ধরীতির অধীনে সংঘর্ষে লিপ্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের দায়। অদ্যবধি পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা উপেক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তান প্রথাগত যুদ্ধরীতি ও আন্তর্জাতিক আইনেরও লঙ্ঘন করছে।

গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও বর্ণ-বৈষম্যকে আইসিজে (ICJ) সর্বোচ্চ (*jus cogens*) অপরাধরূপে চিহ্নিত করেছে, যার তদন্ত ও বিচার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের অলঙ্ঘনীয় দায়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারে তামাদি আইন প্রযোজ্য নয়। পাকিস্তান আঞ্চলিক (territorial) ও বিচারিক (prescriptive) উভয় প্রকার এখতিয়ারের পূর্ণ অধিকারী হওয়া সত্বেও অদ্যভবধি একাত্তরের নৃশংসতার কোন বিচারিক উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আইসিজের সিদ্ধান্ত মতে (*Reparation for Injuries* ও *Interpretation of Peace Treaties* cases) আন্তর্জাতিক চুক্তির লঙ্ঘনে আন্তর্জাতিক দায়ের উদ্ভব হয়। অতএব, Genocide Convention, Geneva Conventions, ICEARD এবং Hague Convention এর অধীনে মৌলিক ও পদ্ধতিগত উভয় প্রকার বাধ্যবাধকতা পালনের ব্যর্থতা পাকিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক দায় সৃষ্টি করেছে।

১৮৯৯ সালে জার্মান আইনবিদ Triepel আন্তর্জাতিক আইন ও বাধ্যবাধকতার "ক্রমাগত লঙ্ঘনের" (continuing internationally wrongful act) জন্য রাষ্ট্রের "অব্যাহত আন্তর্জাতিক দায়" (until ceased) এর ধারণার প্রবর্তন করেন। Triepel এর মতবাদটি আইসিজে সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিচারিক ও আধা-বিচারিক সংগঠন স্বীকৃতি দিয়েছে [*US Diplomatic and Consular Staff in Tehran;Rainbow Warrior; Papamichalopoulos v. Greece; Loizidou v. Turkey*; and *Lovelace v. Canada*]। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, আন্তর্জাতিক আইন কমিশন কর্তৃক প্রণীত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় দায় এর খসড়া বিধানকে ২০০১ সালে স্বীকৃতি দেয় [Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts]। খসড়া বিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৪(২) অনুযায়ী একাত্তরের নৃশংসতার তদন্ত ও বিচার উপেক্ষা করার জন্য পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক চুক্তির অব্যাহত লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা যায়; এর ৩০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক চুক্তির অব্যাহত লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রকে দায়মুক্তির জন্য অনতিবিলম্বে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করতে হয়। এমতাবস্থায়, অব্যাহত লঙ্ঘনের দায় হতে অব্যাহতির লক্ষ্যে পাকিস্তানকে অবশ্যই একাত্তরের নৃশংসতার তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে বাধ্যবাধকতা পালনে পাকিস্তানের ক্রমাগত অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ভাবে একাত্তরের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত ও বিচারের দাবী জোরালো ভিত্তি পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, জেনেভা কনভেনশনের (প্রটোকল-১, অনুচ্ছেদ ৯১) এর বিধান মতে, বা জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের আলোকে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে একাত্তরের নৃশংসতা ও যুদ্ধরীতি লঙ্ঘনের বিষয় সমূহ তদন্ত করা যেতে পারে। এইরূপ তদন্ত কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লেবানন বা যুগোস্লাভিয়া বা রুয়ান্ডা ট্রাইবুনালের ন্যায় একটি এডহক ট্রাইবুনাল গঠন করা যেতে পারে। এমনকি, নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থতার কারণে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্মতির ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কম্বোডিয়া, সিয়েরালিওন ও গুয়েতামালায় সংঘর্ষকালীন নৃশংসতার বিচার নিশ্চিতকল্পে সাধারণ পরিষদ এইরূপ সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে।

আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধের বিচারের একাধিক পন্থা ও সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক ফোরামে যুদ্ধাপরাধের বিচারের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠিত করতে হবে। কেবল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জনমতই পারে পাকিস্তানকে একাত্তরের নৃশংসতার দায় স্বীকার, সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় সম্মত করতে।

জাদুঘরের সংগৃহিত স্মৃতি শব্দ নিয়ে গবেষণা

বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালা

মুক্তিযুদ্ধ অথবা স্মৃতি জাদুঘর গণহত্যা পরবর্তী সমাজ সাধারণভাবে স্মৃতিচারণের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষামূলক কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গণহত্যা প্রতিরোধে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। জাদুঘরের এই ভূমিকা দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষক মো: পিজুয়ার হোসেন এবং আমেরিকার টেক্সাস এ এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জো অ্যান ডিগারজিও-লুটজ ও ক্যালিফোর্নিয়ার পলিটেকনিক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মার্থা গ্যালভান মান্ডুজনোর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং গুয়াতেমালার স্মৃতি জাদুঘরের সংগৃহিত স্মৃতি শব্দ ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করছেন। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং গুয়াতেমালার স্মৃতি জাদুঘর কেবল নিজ সমাজেই নয় বিশ্বব্যাপী গণহত্যাসহ নৃশংস অপরাধ রোধে যে ভূমিকা পালন করছে তা অন্বেষণ করা।

মো: পিজুয়ার হোসেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীলংকায় গণহত্যাবিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের সাথে পরিচিত হন। তাদের একটি দৃঢ় উপলব্ধি হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ বা স্মৃতি জাদুঘরগুলো দর্শকদের নৈতিকভাবে শিক্ষিত করার পাশাপাশি জীবনে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে গণহত্যা রোধে প্রস্তুত করে তুলতে পারে। সেই উপলব্ধি থেকেই তারা এই গবেষণা পরিকল্পনা শুরু করেন যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

শিক্ষার্থীদের পাঠানো মৌখিক ভাষ্য

১৯৭১ সালে রেল স্টেশন থেকে নেমে পাকবাহিনী ছড়িয়ে পড়ল আমাদের চারদিকে। হিন্দুদের মারতে শুরু করল। এই আমগাছের পাশ দিয়ে মাঠের মধ্যে যাচ্ছিল একটা জেলে। তাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধরে চোখের সামনে গুলি করে মেরে ফেলল। সেখান থেকে আমি সামান্য একটু দূরে ছিলাম। তখন হানাদার বাহিনী আমাকে দেখে আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বলল, শালা হিন্দু না মুসলমান তুই? আমি বললাম, আমি মুসলমান। আমার কথা তারা বিশ্বাস করলো না। তারা আমাকে উলঙ্গ করে দেখল আমি মুসলমান। তখন আমাকে তারা সাথে নিয়ে গেল। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তবু মনে সাহস রেখে তাদের সাথে গেলাম। তারা আমাকে বলল, হিন্দুদের বাড়ি কোথায়রে শালা। আমাদেরকে দেখিয়ে দেন। হিন্দুদের মধ্যে না একটা লোক ছিল। তার সাথে আমার খুব খাতির। হিন্দু পাড়ায় ঢুকতে সেই বাড়িটা আগে বাধতো। তার বাড়িটি দেখাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল মনে মনে । তবু কিছু করার নেই! নিজের জানটা বাঁচাবার জন্য আমি বাড়িটা দেখিয়েছিলাম। কারণ, আমি যদি তখন না দেখিয়ে দিই আবার যদি কাউকে জিজ্ঞাস করে হিন্দুদের বাড়ি কোনটা কোনটা, তখন যদি সে আবার বাড়ি দেখিয়ে দেয়, তখনতো আমার বিপদ হতে পারে। সে জন্য বোধহয় বাড়িটা আমি দেখিয়ে দিলাম। হানাদার বাহিনী বাড়ি ঢুকে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে আমার বন্ধুকে গুলি করে মেরে ফেলল। তার সাথে আরও মারলো তার পরিবারের সকলকে। আমার চোখের সামনে আমার বেশ ভালো বন্ধুকে মারা দেখে আমি যেন নিজেই জীবন্ত মারা গেলাম। আমি যেন সব কিছু অন্ধকার দেখতে লাগলাম। তাকে মারার পর মারলো গ্রামের সকল হিন্দুকে। এই দৃশ্যটা আমার আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সূত্র : ৩১৫২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সোহেল রানা	**মো. সৈয়দ মোল্লা**
রামদিয়া বিএমবিসি উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক-দূর সম্পর্কে দাদা
শ্রেণি-৮ম, রোল-৩১	রাজবাড়ি

আমার দাদু একদিন ভাটিয়াপাড়া হাটে যাচ্ছিল। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলে কয়েকজন রাজাকার দুইটি নারীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ভাটিয়াপাড়া পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে। আমার দাদু বলল, রাজাকারদের বাড়ি টসরবন্দ গ্রামে। দাদু তাদের সাবাইকে চেনে। আমার দাদু ওই দৃশ্য দেখে অন্য রাস্তা দিয়ে ভাটিয়াপাড়া হাটে যায়। হাটে যখন আমার দাদু গিয়ে পৌঁছালো তার কয়েক মিনিট পরেই মিলিটারিরা ভাটিয়াপাড়ার হাটের দিকে ঢুকে অনেক গুলি করে এবং অনেক লোককে হত্যা করে। বেশি গুলি করে মধুমতি নদী থেকে এবং এরা সবাই ট্রলারে করে এসেছিল। যখন মিলিটারি চলে গেল দাদু তখন কিছু দূর বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসলেন

এসে দেখলেন অনেক লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। যাদের বেশি কিছু হয়নি তাদেরকে আমার দাদু এবং কিছুলোক সাহায্য করলেন এবং তাদের সবাইকে আমার দাদু এবং অন্যান্য লোকেরা ওই লোকদের বাড়িতে দিয়ে আসলেন।

সূত্র-২৭৬০২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সৌরভ চক্রবর্তী (সুজন)	**সন্তোষ চক্রবর্তী**
মালা শহীদ আসাদুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : তিতুরকান্দি, থানা : আলফাডাঙ্গা
১০ম শ্রেনী, ব্যাবসা শাখা	জেলা : ফরিদপুর, বয়স : ৬২, সম্পর্ক : দাদু

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার নানার চাচার বাড়ি ছিল অসহায় পরিবার। ঐ বাড়ির মধ্যে একদিন রাতে হানা দেয় পাকিস্তানি বাহিনী। তখন বাড়ির মানুষ রাতের খাবার খেতে বসেছে। ভাত মুখে দিবে এমন সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করে। অত্যাচারের মধ্যে ছিল আমার নানা, তার চাচা, তার চাচী তার চাচাত ভাই, বোন, ফুফু, বাবা, মা আরো অনেক আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা। হানাদার বাহিনীদের প্রথম গুলিতে মারা যায় আমার নানার চাচা। তার চাচার গুলির পর শুরু হয় অন্য পুরুষদের ওপর গুলি। সেই গুলিতে মারা যায় তিনজন পুরুষ। আর মহিলারা দৌড়ে পালাচ্ছিল। কেউ পানির নিচে। কেউ গরুর ঘরে। আর হানাদার বাহিনীরাও দৌড়াচ্ছিল মহিলাদের পেছনে। হানাদার বাহিনীরা তাদের অসম্মান করার জন্য তাদের পেছনে ছুটছিল। মহিলারা তাদের সম্মান রক্ষার্থে পালিয়েছিল। তারা প্রায় তিন থেকে চারদিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে পানির নিচে কাধ পর্যন্ত ডুবে থেকেছে। গরুর ঘরে ক্ষুধায় ঘাসলতাপাতা খেয়ে থেকেছে। কিন্তু এত কষ্ট করে থেকেও কয়েকজন মহিলা বাচতে পারেনি হানাদার বাহিনীদের হাত থেকে। প্রায় পাঁচ ছয়জন মহিলাকে অসম্মান করে হানাদার বাহিনী। সেই মহিলারা ছিল আশ্রয়হীন। তারা হানাদার বাহিনীদের হাতে নির্যাতিতা হয়ে লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে তারা আত্মহত্যা করে।

সূত্র : ১৬৩২৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
পপি আক্তার	**আমেনা বেগম**
ফতুল্লা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	আন্দারমানিক, মেহেন্দিগঞ্জ
নবম শ্রেণী (সি)	বয়স: ৭০ বছর।

আমার চাচ্চুর বয়স তখন ১৬ বা ১৭ বছর। টগবগে এক দূরন্ত ছেলে। সেই সময়টায় দেশের সর্বত্র যুদ্ধ চলছে। মুক্তিবাহিনী ও মিলিটারিদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ। আমাদের এলাকায় যখন মিলিটারিরা আক্রমন করল তখন নভেম্বর মাস। বাড়ির সকলেই অন্যত্র পালিয়ে গেল। শুধু আমার চাচ্চু আর চাচ্চুর এক চাচা

রইলেন। আমাদের বাড়িটা মানিকগঞ্জ জেলার বসিহাতি গ্রামে এবং ঢাকা থেকে দৌলতপুরে একটি রেলপথ ছিল। ঠাকুরগাতি ছিল একটি স্টেশন। আমাদের বাড়িটা স্টেশনের খুব নিকটে। একদিন খুব সম্ভবত নভেম্বরের ৭ তারিখ সকাল ৮টার দিকে পাকবাহিনীর একটি দল স্পেশাল ট্রেনে আমাদের স্টেশনে এসে থামে। তারপর দুইজন মিলিটারিকে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে আমার চাচ্চু তার চাচাকে বলল। তারপর তারা দরজা বন্ধ করে দিলেন। পাক বাহিনী ঘরের দরজায় এসে বলল 'এ ঘরমে কোন হে' তখন চাচ্চু ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিল এবং বলল আমি। আমার চাচ্চু আবার কিছু কিছু উর্দু ভাষা জানতেন। বেরিয়ে আসার পর চাচ্চুকে বলে তোমহারা বউ কাহাছে। চাচ্চু বললেন সাদি নেহি করেগা। তখন হানাদারটি চাচ্চুর হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। তারপর বলল হিন্দু কাহাছে। চাচ্চু আমাদের সামনের বাড়িগুলি দেখিয়ে বললেন এ দারছে সব হিন্দু হে। হানাদারটি বলল হিন্দু কাহা জাতা হে। চাচ্চু বললেন ইন্ডিয়াতে সব ভাগজাতা হে। তখন হানাদারটি বলল তুম মুক্তি হে, চাচ্চু বললেন হাম মুক্তি নেহি। তখন ঐ হানাদারটি তাকে এক চড় দিলেন এবং টেনে স্টেশনের দিকে নিয়ে গেলেন। আর তাদের ব্যাগটা চাচ্চুর কাছে দিলেন। চাচ্চু ব্যাগটা একদম ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর হানাদারটি তাকে আরেকটা চড় দিল এবং আরেকটা হানাদার চাচ্চুকে গুলি করার জন্য তৈরি হচ্ছিল ঠিক তখন চাচ্চুর চাচা এসে হানাদারদের বলল ও বাচ্চা ছেলে ওকে ছেড়ে দিন। তখন আরেক হানাদারের মায়া হল এবং বলল উনকো ছোড় দো। তারপর তারা চাচ্চুকে ছেড়ে দিল। তারপর আমার চাচ্চু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হবেন এবং পরদিন থেকেই মুক্তিবাহিনীর সাথে ট্রেনিং শুরু করেন। তারপর যখন উনার ট্রেনিং শেষে অস্ত্র হাতে পাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

সূত্র :২৪৬২৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোসা. জান্নাতুল ফেরদৌস	**মো. মোহাম্মদ কালাম হোসেন**
দৌলতপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : দৌলতপুর, থানা : দৌলতপুর
৬ষ্ঠ শ্রেনী, ক শাখা, রোল : ৩৫	জেলা : মানিকগঞ্জ
	বয়স : ৭৫, সম্পর্ক : প্রতিবেশী

ঢাকা বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের মন্তব্য

আমি আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে অনেক ভালোবাসি। আমি আমার এ দেশকে পেয়েছি হাজার বছরের প্রতিক্ষার পর। হাজার বছরের প্রতিক্ষা ও সংগ্রামের ফল হিসেবে পেয়েছি একটি স্বাধীন বাংলাদেশ। এই স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে এক মরণপন মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনা প্রমাণ যদিও চোখের সামনে পাওয়া যায় না তবুও এগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধ দেখা যায় কিভাবে এ দেশের দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। তাঁরা তাদের তাজা রক্তের বিনিময়ে এদেশকে স্বাধীন করেছেন। প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ও মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের উচিত এই প্রিয় জন্মভূমিকে রক্ষা করা।

মো: নাঈমুর আলম নাঈম
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল নং-২
পাংশা জর্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

আজ আমরা খুবই গর্বিত। কারণ আজ আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জেনেছি। যা আগে আমাদের এতটা ধারনা ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দেখে হয়ত অনেক কিছু জেনেছি এবং বুঝেছি আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই করুণ ঘটনাগুলো। এ দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাণ বিসর্জন করেছে। তাদের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এ সব করুণাময় ঘটনাগুলো আমাদের মনের গভীরে ছাপ ফেলে। মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশ। আমরা এ দেশকে ভালোবাসি। এ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভালোবাসি আরও ভালোবাসি বাংলার মায়েদের। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালোবাসা রইল। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু-

সূচনা রানী ও রত্না রানী
দশম শ্রেণি, বান্টি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

আমি বাঙালি, একথা এতদিন শুনেছি, জেনেছি। আজ অনুভব করতে পারলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে আজ মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র দেখতে পেরে আমার চেতনাবোধ ফিরে এলো। বড়দের কাছ থেকে শুনেছি শুধু, আজ সচক্ষে দেখতে পেরে আমার শরীরের প্রতিটি রক্ত বিন্দু সোচ্চার হলো। মুক্তিযুদ্ধের এই নির্মম ইতিহাস না জানা থাকলে হয়তো আমার পরিচয়টাও না জানা থেকে যেত। আমার স্বাধীনতা, আমার জীবন জানতে পেরে আমি ধন্য। কাগজে কলমে লিখে প্রকাশ করতে কতটুকু পারবো তা আমি জানি না, তবে আমি চিৎকার করে বলতে পারবো আমি স্বাধীন, বাংলা আমার মায়ের ভাষা, আমি একটা মুক্ত পাখি, আমাকে এখন আর রুখবে কে?

রিক্তা খানম, মানবিক শাখা, রোল নং-৫২
বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের জন্য একটি আদর্ষ সরূপ। এটি খুব ভাল একটি উদ্যোগ, কারণ সারা দেশে ঘুরে দেশের ছাত্রসমাজকে এ সকল মুক্তিযুদ্ধের অনেক নিদর্শন দেখানোর জন্য ছাত্রসমাজ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারছে। এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফরিদপুর জিলা স্কুলে এসেছে বলে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অনেক শুভেচ্ছা। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অনেক শুভেচ্ছা। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর অনেক সুন্দর নিদর্শন দেখানো হয়েছে। কিন্তু আরও কিছু নিদর্শন দেখালে হয়ত বেশি ভালো লাগত। আর পর্দায় প্রদর্শনিটি আরও সুন্দর লেগেছে। এই প্রদর্শনিটি আরও একটু বেশি সময় প্রদর্শন হলে বেশি ভালো লাগত। তবে যাই বলি এ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশে ছাত্রদের জাগরিত করছে যা অন্য কেউ করছে না। আর একটি কথা এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি বাংলাদেশের গ্রামে গেলে গ্রামের মানুষও এ সম্পর্কে যানতে পারত। বাংলার ছাত্রদের অতীত স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলার মানুষের জীবনে বাংলার স্বাধীনতা অমর হয়ে থাকুক।

মুজাহিদ হোসেন
৮ম শ্রেণি (প্রভাতী), ফরিদপুর জিলা স্কুল

যারা আমাদের এই দেশকে মুক্ত করার জন্য নয় মাস যুদ্ধ করেছেন তাদের ঋণ আমরা কখনই শোধ করতে পারব না। তবে আমরা তাদের সারাজীবন মনে রাখব। আর এই প্রামাণ্য চিত্রটি দেখে আমার খুব ভালো লাগল। কারণ এর মাধ্যমে আ-মরা তথা দেশের সকল ছাত্রছাত্রীরা মক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের অজানা কথা জানতে পারবে। তাই এর জন্য আমি অনেক আনন্দিত এবং যারা এটি প্রচারে সাহায্য করছেন তাদের আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

নুসরাত জাহান লিনা
দশম শ্রেণি, রোল নং-২৮, এস কে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,মানিকগঞ্জ

জার্মানির ডাকাউ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশগ্রহণ

গত ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় ``Education and Memory in Times of a Global Crisis'' শীর্ষক ওয়েবিনার। ওয়েবিনার-এর আয়োজক Dachau Concentration Camp Museum of Germany। বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, ইসরায়েল ও ফ্রান্সের চারটি জাদুঘর এতে অংশ নেয়। বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এই আয়োজনে যোগ দেন এবং এই বৈশ্বিক মহামারিকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার দুর্যোগকে সুযোগে পরিবর্তন করে, প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বিবরণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরেন।

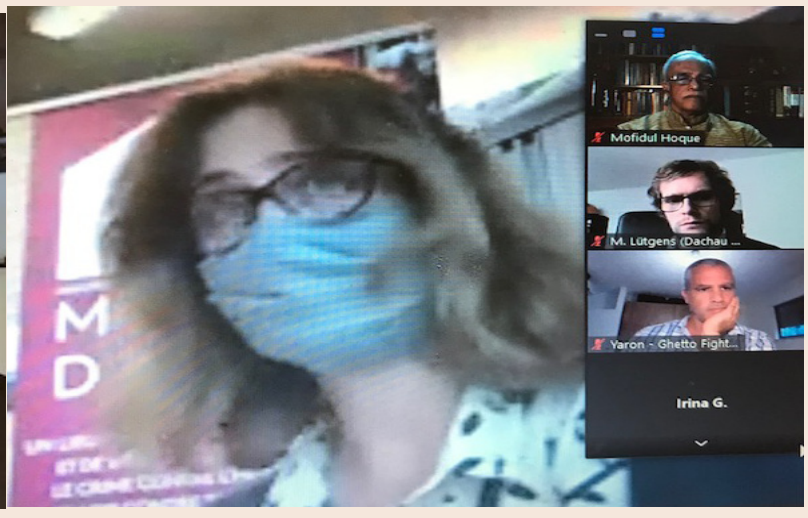

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : নভেম্বর ১৯৭১

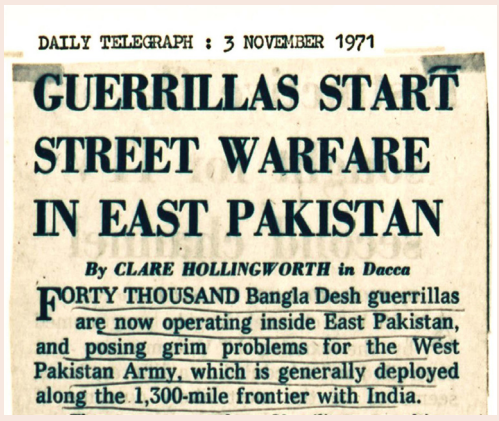

DAILY TELEGRAPH : 3 NOVEMBER 1971

GUERRILLAS START STREET WARFARE IN EAST PAKISTAN

By CLARE HOLLINGWORTH in Dacca

FORTY THOUSAND Bangla Desh guerrillas are now operating inside East Pakistan, and posing grim problems for the West Pakistan Army, which is generally deployed along the 1,300-mile frontier with India.

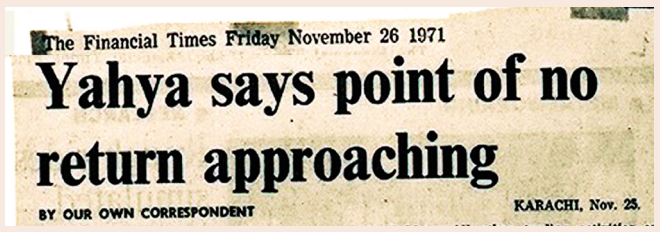

The Financial Times Friday November 26 1971

Yahya says point of no return approaching

BY OUR OWN CORRESPONDENT — KARACHI, Nov. 25.

NEW STATESMAN 5 NOVEMBER 1971

Bangla Desh: Why Britain Must Act

ALAN LEATHER*

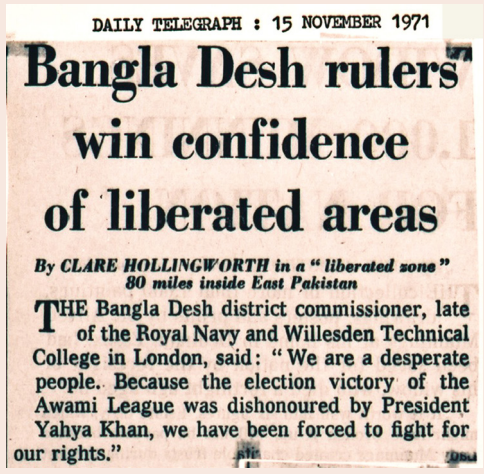

DAILY TELEGRAPH : 15 NOVEMBER 1971

Bangla Desh rulers win confidence of liberated areas

By CLARE HOLLINGWORTH in a "liberated zone" 80 miles inside East Pakistan

THE Bangla Desh district commissioner, late of the Royal Navy and Willesden Technical College in London, said: "We are a desperate people. Because the election victory of the Awami League was dishonoured by President Yahya Khan, we have been forced to fight for our rights."

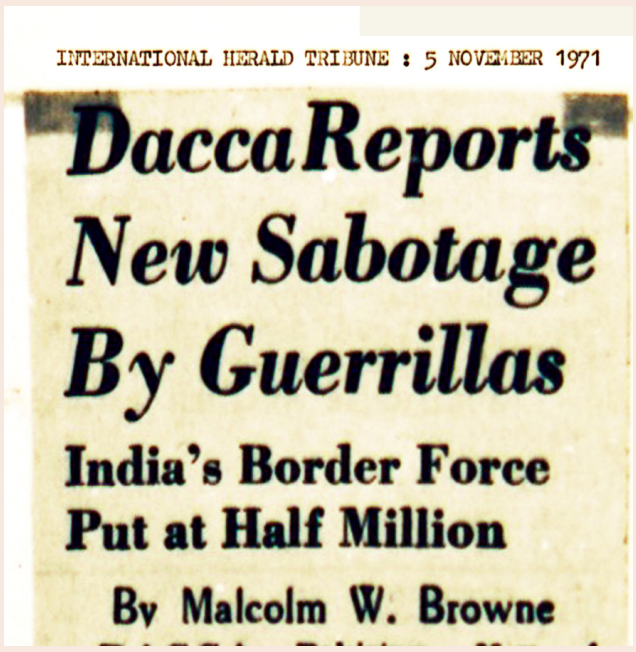

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE : 5 NOVEMBER 1971

Dacca Reports New Sabotage By Guerrillas

India's Border Force Put at Half Million

By Malcolm W. Browne

MORNING STAR Tuesday November 9 1971

Bangla Desh close-up—5

This is a liberation struggle against a colonialist junta

Assistant Editor WILLIAM WAINWRIGHT continues the account of his visit to India and the Bangla Desh background.

INDIA NEWS :6 NOVEMBER 1971

Mujib's Release Will Ease Tension, says Chancellor Kreisky

The Austrian Chancellor, Mr. Bruno Kreisky, has suggested that the release of Sheikh Mujibur Rahman will lead to the easing of tension on the Bangla Desh issue.

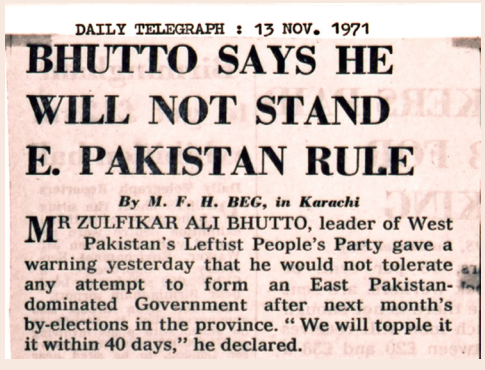

DAILY TELEGRAPH : 13 NOV. 1971

BHUTTO SAYS HE WILL NOT STAND E. PAKISTAN RULE

By M. F. H. BEG, in Karachi

MR ZULFIKAR ALI BHUTTO, leader of West Pakistan's Leftist People's Party gave a warning yesterday that he would not tolerate any attempt to form an East Pakistan-dominated Government after next month's by-elections in the province. "We will topple it it within 40 days," he declared.

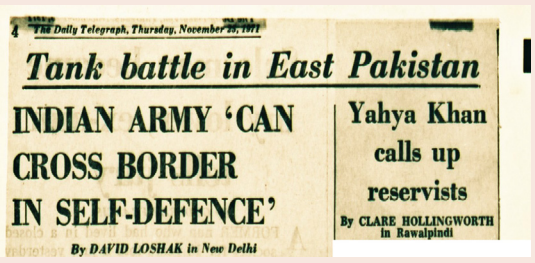

The Daily Telegraph, Thursday, November 25, 1971

Tank battle in East Pakistan

INDIAN ARMY 'CAN CROSS BORDER IN SELF-DEFENCE'

By DAVID LOSHAK in New Delhi

Yahya Khan calls up reservists

By CLARE HOLLINGWORTH in Rawalpindi

সিএসজিজে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ২০২০ সনদপত্র প্রদান

সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস ১১ নভেম্বর ২০২০ জাদুঘর প্রাঙ্গণে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ-এর সনদপত্র প্রদান করে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ১১টি পৃথক গবেষণা প্রবন্ধ জমা হয়। ১৫ জন জুনিয়র রিসার্চ ফেলো চার মাসব্যাপী গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও আইনী ব্যাখ্যা, গণহত্যা এবং নির্যাতনের নানা দিক নিয়ে অনুসন্ধান ও বিস্তারিত তুলে ধরেন তাদের গবেষণা প্রবন্ধে। প্রতিটি গবেষণা একজন মেন্টরের মাধ্যমে গবেষকরা পরিচালনা করেছেন। শেষ পর্বে একজন পৃথক পর্যালোচকের মতামত গ্রহণ করেছেন অনলাইন ডিফেন্স-এর মাধ্যমে। এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকল পরামর্শদাতা, পর্যালোচক এবং গবেষকদের সেন্টারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করছে
গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স

মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন প্রজন্মের নবীন গবেষকদের জন্য আয়োজন করতে যাচ্ছে ''গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স''। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এই কোর্স শুরু হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস-এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার ইতিহাসবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মূল প্রশিক্ষক হিসেবে কোর্স পরিচালনায় সম্মতি প্রদান করেছেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় অভিজ্ঞ ইতিহাসবিদগণ প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন।

একজন নবীন গবেষকের জন্য প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা যায় গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই সংক্রান্ত জ্ঞানের ঘাটতি। ফলস্বরূপ দেখা যায় একই বিষয় নিয়ে বারবার গবেষণা হলেও এখনও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করার অনেক দিক অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে। একই সাথে গবেষণা পদ্ধতির জ্ঞান অপ্রতুল থাকায় এ বিষয়ে মানসম্মত গবেষণার অভাব দেখা যায়। গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সে একজন নবীন গবেষককে বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণ, তথ্যের ব্যবহার, তথ্যের যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিসহ গবেষণার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এ বিষয়টিও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মানবিকবিদ্যা গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধ একটি বিশেষ ক্ষেত্র। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ গবেষক তৈরিতে ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশাবাদী। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে খুব শীঘ্রই দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন rezina_bd@yahoo.com এই ইমেইল এড্রেসে।

স্মৃতির পথে হাঁটা

নোবেল বিজয়ী বাঙালি অমর্ত্য সেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরির্দন করেন ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে

বঙ্গবন্ধু কালপঞ্জি : নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের তথ্য প্রেরণের আবেদন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্যভাণ্ডার প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছেন দেশের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্ক শিক্ষক মন্ডলী। বিভিন্ন এলাকায় বঙ্গবন্ধুর আগমনের তথ্য জমা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভান্ডারে। আর এভাবেই সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরবর্তী জন্মের জন্য রচনা করবে বঙ্গবন্ধুর জীবনকর্মের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র। বঙ্গবন্ধু দেশব্যপী পরিভ্রমণকালে আনুষ্ঠানিক সভা-সমাবেশের বাইরেও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের অনুরোধে করেছেন অসংখ্য পথসভা, কাছে টেনে নিয়েছেন ছাত্র-জনতাকে। তেমনই দুটি তথ্য এখানে তুলে ধরা হলো-

বড়ুয়াহাট টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, কাউনিয়া রংপুর থেকে সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল হুদা জানিয়েছেন, ''১৯৬১ সালে (এপ্রিল/মে) কারামুক্তির পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন জেলা সফর করেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি ঢাকা থেকে ট্রেন যোগে লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম সফর করেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর বিকেল ৩.০০/৩.৩০ মিনিটে ট্রেনটি কাউনিয়া রেলস্টেশনের ২নং লাইনে দাঁড়ালে আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই। উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে আমি ফুলের মালা বঙ্গবন্ধুর গলায় পরিয়ে দেই। ট্রেনটি ১০-১৫ মিনিট দাঁড়ানো ছিল। সবার পক্ষ থেকে আমি বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করি আগামীকাল যখন রংপুর ফিরবেন তখন যেন কাউনিয়া রেলস্টেশনে অল্প সময়ের জন্য পথসভা করেন। পরের দিন কখন লালমনিরহাট থেকে ফিরবেন জানা ছিল না। তাই ভোর থেকেই আমরা কাউনিয়া রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। আনুমানিক সকাল ৮.০০-৯.০০ টার মধ্যে ট্রেনটি কাউনিয়া স্টেশনে পৌঁছে। জনতার ভিড় উপেক্ষা করে করমর্দন করতে করতে 2nd class waiting room - গিয়ে বসেন বঙ্গবন্ধু। রুমের ভিতরে ২৫-৩০ জন এবং রুমের বাইরে প্লাটফর্মে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। রুমের ভিতরে স্থানীয় নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন (ইউনিয়ন এবং থানা পর্যায়ের) সভাপতি ডা. আব্দুস সাত্তার, কোষাধ্যক্ষ ডা. ইদ্রিস আলী, এলাহী বকস মন্ডল, এবং সাবেক ইউপি সদস্য মফিজ উদ্দিন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ, জিল্লুর রহমান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। বঙ্গবন্ধু রুমের ভিতরে মাইক্রোফোন ছাড়াই চেয়ারে বসে ৮-১০ মিনিট খোলা মেলা কথা বলেন এবং স্বল্প পরিসরে চা চক্র সেরে নেন। এরই ফাঁকে জনাব জিল্লুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি সদস্যভুক্তির রশিদ আমার হাতে তুলে দেন। যা পরবর্তীতে সদস্যভূক্তির কাজে ব্যবহৃত হয়। চা নাস্তা শেষে স্টেশনের দক্ষিণপাশে সাজানো একটি ছোট মঞ্চে ১০-১৫ মিনিট বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈরীতা দুর করে স্বাধীন বাংলাদেশ রচনা করা সম্ভব।'' তথ্যটি তিনি সংগ্রহ করেছেন শাহ আব্দুল আখের মিয়ার নিকট হতে যিনি ১৯৬৯ সালে পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউনিয়া থানা শাখার দপ্তর সম্পাদক ছিলেন।

বিশ্বনাথ, সিলেট এর হাজী মফিজ আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর সহকারী শিক্ষক আব্দুল হান্নান ইউজেটিক্স মুক্তিযোদ্ধা এড মুজিবুর রহমান চৌধুরীর বয়ানে জানান, ''১৯৫৩ সালে আমি প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখি, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত যুক্তফ্রন্টের প্রচার কার্যে তিনি সিলেট আসেন এবং বারুতখানা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ওঠেন। আমরা সেখানে হাজির হতেই তিনি হাত নেড়ে আমাদের সম্মান জানান পরবর্তীতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান সহ তিনি সিলেট আসেন। সভা হয় বর্তমান রেজিস্ট্রি মাঠে, ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি খাট ও চৌকি সংগ্রহ করে উঁচু মঞ্চ বানানো হয়েছিল। বক্তৃতা শেষে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে আসেন, আমরা ছাত্র, বই হাতে দেখেই আমাদের জিজ্ঞেস করেন, আমরা কেমন আছি? কোথায় পড়ি ইত্যাদি। তাঁর আদরমাখা দরদী কথা শুনে আমরা মুগ্ধ হই। তাকে স্যার সম্বোধন করে বলি আমরা রাজা জিসি হাইস্কুলে পড়ি, আপনার ভাষণ শোনার জন্য এবং আপনাকে এক নজর দেখার জন্যই এখানে আসা। তখন তিনি সস্নেহে সকল ছাত্রের উদ্দেশ্যে বললেন, ''আমাকে স্যার নয়, সবাই মুজিব ভাই বলবা, বুঝলি-।'' এমন মমতাময়ী বাক্য শুনে আমরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি।''

বঙ্গবন্ধুর পদচ্ছাপ : তথ্য প্রেরণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এলাকায় বঙ্গবন্ধুর আগমন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তথ্য প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এ সংখ্যায় সংযুক্ত হলো–

৪৬. বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
৪৭. প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট
৪৮. সৃজন বিদ্যাপীঠ, সুনামগঞ্জ
৪৯. এ এ টি এম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, শমসেরনগর কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
৫০. মৌলানা মুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ রাজনগর, মৌলভীবাজার
৫১. তালবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজ, যশোর
৫২. হাজী আব্দুস সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়, টুকের বাজার, সিলেট
৫৩. আল আমীন রহমান, ডোমার, নীলফামারী
৫৪. লিটল হার্টস স্কুল, ডোমার, নীলফামারী
৫৫. হারদী মীর শামসুদ্দীন আহম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
৫৬. স্বরূপদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শার্শা, যশোর
৫৭. সরকারি জুবলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ
৫৮. মো. রুহুল ইসলাম, সহকারি অধ্যাপক, যশোর
৫৯. রাজৈর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজৈর, মাদারীপুর
৬০. সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ডিগ্রী কলেজ, শার্শা, যশোর
৬১. বাদাঘাট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বাদাঘাট, সিলেট
৬২. দিরাই সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ
৬৩. ডা. আজহার উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লালমোহন, ভোলা
৬৪. জে টি কে ইউ দাখিল মাদ্রাসা, চৌগাছা, যশোর
৬৫. চান্দুশাহ জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, সিলেট
৬৬. কালীগঞ্জ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৬৭. দক্ষিণ ব্যাপারীহাট স্কুল এন্ড কলেজ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
৬৮. বিনোদপুর বসন্ত কুমার মাধমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর, মাগুরা
৬৯. আশেক আলী খান উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কচুয়া, চাঁদপুর

১৪ নভেম্বর ২০২০

অনুষ্ঠিত হলো ৩৫তম অনলাইন নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী

ঢাকা মহানগর (উত্তর)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজ-এ সংযুক্ত থাকুন

সাম্প্রতিক করোনা মহামারীর এই বিশেষ পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলায় অনলাইন সম্পৃক্ততার চিহ্ন সর্বত্র লক্ষণীয়। এই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজস্ব পেজ ওপেন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে জুলাই ২০২০ এই অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি সূচনা হবার পর গত ৫ মাসে এর ফলোয়ার সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় ১৫০০। আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে ২ অক্টোবর ২০২০ অনলাইনে আয়োজিত 'আমাদের গানে অহিংসার বাণী' শীর্ষক কনসার্টটি প্রায় ৯০ হাজার দর্শক উপভোগ করেছেন। জাদুঘর আশাবাদী এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটি জাদুঘরকে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যেতে পারবে বলে। মুক্তিযদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজে যুক্ত থেকে জাদুঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার এবং জাদুঘরের নিয়মিত অনলাইন আয়োজন দেখবার জন্য www.facebook.com/liberationwarmuseum.official এই লিংকটি লাইক এবং ফলো করুন এবং আপনার পরিচিতজনের সঙ্গে শেয়ার করুন। নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা এই লিংকটি শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শেয়ার করুন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা সাবস্ক্রাইব করুন

গত জুন মাস থেকে নিয়মিত প্রতিমাসে প্রকাশিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা। ইমেইল যোগে এই বার্তাটি পৌছে যাচ্ছে সকলের হাতে। এছাড়াও অন্যান্য ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবারেও অনেক সুহৃদজন এই নিউজ লেটারটি পাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তাটি যারা নিয়মিত পেয়ে থাকেন তাদের প্রতি নিজস্ব পরিমণ্ডলে অনলাইন মাধ্যমে এটি ছড়িয়ে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি, বিশেষত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের প্রতি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে ইমেইল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে এটি পৌছে দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও যারা নিয়মিত এই বার্তাটি অনলাইনে পেতে ইচ্ছুক তারা নিজ নিজ নাম, ইমেইল এড্রেস, পেশা ও বয়স জানিয়ে সরাসরি ইমেইল করবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। আমাদের ইমেইল এড্রেস : mukti.jadughar@gmail.com

রবিউল হুসাইন স্মারক গ্রন্থ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত ট্রাস্টি, একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মরণে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ব্যক্তি ও কর্মজীবনে সদালাপী, সরলমনের এই গুণী ব্যক্তিত্ব অসংখ্য মানুষের প্রিয়ভাজন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর পরিজন, সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়িদের আহ্বান জানাচ্ছে রবিউল হুসাইনকে স্মরণ করে তাদের লেখা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পৌছে দিতে, আমাদের ইমেইল এড্রেস : mukti.jadughar@gmail.com

ভুলেও ভুল ক'রে
ভোলা কি যায় তারে...

২৬ নভেম্বর ২০১৯। আকস্মিক এক বিষাদ ছেয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। প্রয়াত হন ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন। সদালাপী, সদা হাস্যোজ্জ্বল, অজাতশত্রু, কাজঅন্তপ্রাণ এই মানুষটির বিদায়ে জাদুঘর পরিবার শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। শূন্যতার এক বিশাল গহ্বর সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতার মাঝে রয়ে যায় এক শক্তির আধার, যা আমাদের শেখায় জীবনের সকল অভাববোধ, কষ্টবোধের উর্ধ্বে উঠে হাসিমুখে সমষ্টির জন্য কাজ করে যেতে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ও ভালোবাসায় স্মরণ করি তাঁকে।

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে ডানে) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, রবিউল হুসাইন, মফিদুল হক, আসাদুজ্জামান নূর ও জিয়াউদ্দিন তারিক আলী

স্মরণ

ডা. সারওয়ার আলী
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

রবিউল হুসাইন একজন উচ্চমানের স্থপতি, কবি ও চিত্রকর্ম সমালোচক। এ তিনটি পরিচয়ে সে সমধিক পরিচিত। তবে অন্তরের গভীরে সে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের তাগিদ লালন করেছে। নব্বই-এর প্রাথমিক পর্যায়ে সে ও আক্কু চৌধুরী একাত্তরের যাত্রী নামে এক সংগঠনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব ও মুক্তিযুদ্ধের প্রায় একশত আলোকচিত্র সম্বলিত অ্যালবাম তৈরি করে এবং বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের মাধ্যমে সারা দেশে বিতরণের ব্যবস্থা করে। তাদের দুজনের তাগিদেই ১৯৯৫ এর শুরুর দিকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টিদের প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় এবং এক পর্যায়ে এই লক্ষ্যকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, আগারগাঁওয়ে স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জানিয়েছেন যে, তিনি ও রবিউল হুসাইন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলেন। বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ এবং বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের কারণে সে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় জাদুঘরের যথাক্রমে ট্রাস্টিবোর্ড ও পরিচালনা পরিষদে তার অবস্থান সুনিশ্চিত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের পর বড় অন্তরায় দাড়ায় উপযুক্ত ভবনের অভাব। ঢাকা ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক ভবন-সর্বস্ব শহর। দু'একটি বাসা বাড়ি পছন্দ হয় কিন্তু জাদুঘরের জন্য তারা ভাড়া দিতে নারাজ। অবশেষে জানা গেলো সেগুন বাগিচায় একটি দোতলা বাড়ি পাওয়া যেতে পারে। ভাড়াটিয়ারা দীর্ঘদিন ভাড়া দেন না, বরং বহুজনকে সাবলেট দিয়েছেন। ট্রাস্টিরা প্রথম পরিদর্শনে লক্ষ্য করে প্রতিটি ঘরে পৃথক পরিবার বসবাস করে, পূবে ও পেছনে একটি লুপ্তপ্রায় পত্রিকার প্রেস রয়েছে, সিঁড়ির তলায় কয়েকটি ছাগল বেধে রাখা হয়েছে। আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, এ বাসায় জাদুঘর করা যাবে না। কিন্তু রবিউল কয়েক দশক আগে বৃটিশ আমলে নির্মিত ভবনটি দেখে মুগ্ধ। তার বিশ্বাস এখানেই জাদুঘর করা যাবে। প্রধানত: ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূরের উদ্যোগে অবৈধ ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় এবং এই পরিত্যক্ত ভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে সময় শহীদুল্লাহ্ এসোসিয়েটের পরিচালক রবিউল হুসাইন। সে টিনের ছাদের প্রেসের স্থানে গড়ে তোলে সম্মেলন কক্ষ, পেছনে তৈরি হলো উন্মুক্ত মঞ্চ, যা কয়েক দশকের বহু অনুষ্ঠানের সাক্ষ্য বহন করেছে। এই বনেদি ভবনের স্থাপত্য-শৈলী অক্ষুণ্ন রেখে গড়ে ওঠে ছয়টি গ্যালারি, দর্শনার্থী নির্গমণের পথ লোহার ঘোরানো সিঁড়ি – প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের বাঙালির আত্মদান ও গৌরবের ইতিবৃত্ত দেখে দর্শনার্থীরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করে। তিনতলার চিলেকোঠা পরিবর্তিত হয় শীততাপ ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রিত আর্কাইভে। এই রূপান্তরের মূল পরিকল্পনাকারী রবিউল হুসাইন।

যখন কবিসত্ত্বা ও বিদগ্ধ চিত্রকলা-বোদ্ধার সাথে বাঙালি জাতিসত্ত্বার প্রতি গভীরভাবে অনুগত আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের সংযোগ ঘটে, তখন প্রয়োজনীয়তা (functionality) ও নান্দনিকতার অপরূপ সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। আমরা তার পরিচয় পেয়েছি, মিরপুরের জল্লাদখানার স্মৃতি সংরক্ষণে। মিরপুরের বেনারশী পল্লীর শেষ প্রান্তে মাত্র চার কাঠা জমিতে একটি পরিত্যক্ত পাম্প হাউজ ছিল, সেখানে একাত্তর সালে প্রধানত: স্বাধীনতা বিরোধী বিহারীরা বাঙালিদের হত্যা করে এই গভীর কূপে নিক্ষেপ করতো। রবিউল হুসাইন এক অনবদ্য নকশা তৈরি করে – চারধারে বাংলা ইটের প্রাচীর, দেয়াল ঘিরে সারা দেশ থেকে সংগৃহীত বধ্যভূমির পবিত্র মৃত্তিকা রাখার স্থান, কূপের কক্ষ, কূপটি অক্ষুণ্ণ রেখে শহীদদের ব্যবহৃত জিনিষের প্রতীকী প্রদর্শন আর জমির পশ্চিম প্রান্তে যুক্ত হয়েছে শিল্পী মনিরুজ্জামানের সহযোগিতায় শিল্পী রফিকুন্নবীর পোড়া মাটির ইটের তৈরি ম্যূরাল। সম্পূর্ণ এলাকাটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য ল্যাণ্ডস্কেপ শিল্পকর্ম। পরে সে একটি টাওয়ার তৈরি করেছে। সারা দেশে রবিউল হুসাইনের করা প্রচুর স্থাপত্যকর্ম রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে বাংলার মাটি, লাল পোড়া ইট ও বাংলাদেশের আবহাওয়া সহিষ্ণু নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, আর সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ নকশা। এখানেই তার বাঙালিয়ানার পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যাবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘিরে চলেছে বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ। তার অধিকাংশ কর্মসূচিতে রবিউল হুসাইনের অংশগ্রহণ ছিল। তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য ভূমিকার উল্লেখ পাওযা যাবে। আগারগাঁওয়ে বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থপতি ইন্সটিটিউটের চার মেয়াদের সভাপতি রবিউলের কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিশ্চিত হয়েছে। এজন্য যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, ট্রাস্টিবোর্ডের পক্ষ থেকে এই আন্তর্জাতিক জুরিবোর্ডের সদস্য ছিলেন রবিউল হুসাইন ও মফিদুল হক। তার বিবেচনাবোধ সকল জুরিবোর্ড সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মৃত্যুকালে রবিউল হুসাইন ছিল জাদুঘরের প্রধান সমন্বয়কারী সদস্য-সচিব।

সর্বোপরি, রবিউল হুসাইন একজন হৃদয়বান মানুষ। তার সকল বন্ধু ও স্বজনের কষ্টে সে দুঃখ পায়, তাদের আনন্দে সে শিশুর মতো উল্লাসে ফেটে পড়ে। যথেষ্ট সমস্যা ও সংকটের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু লোভ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। স্ত্রীর অকাল বিয়োগে সে মূহ্যমান হয়েছে, পুত্রের সুস্বাস্থ্য ভাবনা তাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে– অথচ তার সহাস্য চেহারায় তা রেখাপাত করে নি। কিছুটা আত্মভোলা অজাতশত্রু মানুষ; তাই সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতার তুলনা নেই।

রবিউল ভাই তার কর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবেন।

বেদনার স্থাপত্য-ভরা অনুপম

‘যার হাতে গড়ে ওঠে মানুষের বাস্তু-সংস্থান, একটা জাতির কীর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ, সৌধমালা, গগনস্পর্শী ঘরবাড়ি আবার সেই হাতেই যখন রচিত হয় অনর্গল ধারায় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভারী ভারী নিবন্ধ-সন্দর্ভ, কলা সমালোচনা- তখন যে কোনো বিশেষণই তার জন্য বাহুল্যমাত্র। রবিউল হুসাইন-এর কবিতার নির্মাণ স্থাপত্যশিল্পের মতোই হিমায়িত ধ্রুপদী সংগীত।’

যে আসে সে ফিরেও যায়। তবুও তো কারো-কারো পায়ের চিহ্নে ফুটে ওঠে বর্ণময় পুষ্পশোভা, দেশগন্ধ। পলির ভেতর, ধুলোর মধ্যে, কাঁকড়ের পিঠে খেলা করে রোদ– মায়া বাড়ায় ছায়া। রোদখেলা আর ছায়ামায়ার জগৎ-সংসারে নির্মাতা যখন সৃষ্টিরূপে নিমগ্ন হন তখন তল্লাশের অংশটি নানা পর্যায়ে বিবেচনায় ভর করে। এবং তাই স্থপতি রবিউল হুসাইনকে, কবি রবিউল হুসাইনকে অবলোকনও এক পোশাক বদলের পালা। স্থপতির কর্মযোগে আছে নির্মাণের বিবিধ কৌশল, তদ্রুপ কবির সৃষ্টিধর্মে আছে প্রভূত লীলা।

রবিউল হুসাইন উন্মোচনে আমরা কি অপরাগ? তিনি কি রকমারি অসমাপ্ত নকশা? না, চিত্রটি পরিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ। ভ্রান্তির অবকাশ সেখানে ক্ষীণ! কেননা নির্মাণ ও সৃষ্টির অভ্যন্তরের একটি ‘না’ কে তিনি অবিরাম ‘হ্যাঁ’-তে পরিণত করার অভিলাষ ব্যক্ত ক’রেছেন আমৃত্যু। বাংলা কবিতায় তাঁর বিশিষ্টতার সাক্ষ্য বহন ক’রে কবিতাগ্রন্থসমূহ। একে একে উল্লেখ করা যায়–‘সুন্দরী ফণা,’ ‘কোথায় আমার নভোযান’, ‘কেন্দ্রবিন্দুতে বেজে ওঠে’, ‘আরো ঊনতিরিশটি চাঁদ’, ‘কী আছে এই অন্ধকারের গভীরে’, ‘কর্পূরের ডানাঅলা পাখি’, ‘স্থিরবিন্দুর মোহন সংকট’, ‘এইসব নীল অপমান’, ‘যে নদী রাত্রির’, ‘আমগ্ন কাটাকুটি খেলা’-র কথা। গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই যে বিরাজ করে অপর এক পৃথিবী, পৃথক এক সংসার। যা কখনো-কখনো বেদনার অংশ হ’য়েও আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করে। একটা বৃহৎ অংক কোথায় যেন শূন্যকে লোফালুফি ক’রতে-ক’রতে হারিয়ে যায় মহাশূন্যে। আবার এর অন্যপিঠে একটা ভূগোল একের সঙ্গে জুড়ে দেয় বহুর চাকা। ফলে ও ফসলে যার চেহারা অপরিচিত হ’তে-হ’তে পরিচিত হ’য়ে ওঠে। আমাদের কামনার অংশগুলো, আমাদের বাসনার খণ্ডগুলো ‘বিষুব রেখা’ অতিক্রম ক’রে ঢুকে পড়ে ‘উজ্জয়িনীর মকরগলি’তে।

২

আমাদের যখন পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সময়, তখন তাঁর পাল্লা খুলে বেরোনোর বেলা। গত শতাব্দীর সেই

ষাট দশকের মধ্যভাগে যখন আকাশভর্তি অন্ধকার, জমিনজোড়া ধুলো এবং জল ছলছল নেত্রমণ্ডল তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় তোলপাড় ক’রে কতিপয় বিদ্যার্থী ‘না’ ধ্বনিতে হারিয়ে দিচ্ছে সকল ‘হ্যাঁ’-কে। এই ‘না’ যেন অবজ্ঞার, অবহেলার, বিসর্জনের এবং বিনির্মাণের। শিল্প-সাহিত্যের প্রচলিত অঞ্চলটি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার খেলায় মত্ত তরুণদের অন্যতম ছিলেন রবিউল হুসাইন। স্থপতি রবিউল হুসাইন শব্দ-লাটিমের তৈরি বৃত্তটি পেন্সিলের অগ্রভাগে ভেঙে কলমের ডগায় তৈরি করলেন অনন্ত নক্ষত্রের মেলা। আকাশ উপুড় করে যেন তারকারাজি ছড়িয়ে পড়লো ভূ-ভাগে তৈরি হলো নতুন কবিতার মালা। কবি রবিউল হুসাইনের বোধের বিন্দুটি এতো বেশি নড়েচড়ে যে তাকে ছোঁয়া প্রায় দুরূহ। যে মুহূর্তে তিনি বলেন, ‘তখন ছিলো বৃহৎ জীবন ক্ষুদ্র বৃত্ত/ এখন অনেক ক্ষুদ্র জীবন বৃহৎ বৃত্ত’; ঠিক পর মুহূর্তেই স্থিরকৃত কেন্দ্র থেকে স’রে গিয়ে আবিষ্কার করেন ‘ঘুরছি আমি ঘুরবো আমি/ মধ্যবৃত্তে মৃত্যুবধি ঘুরছি আমি অবিরত।’ কবিতাকে নিয়ে এই যে খেলা, তা বুঝি বা ছড়িয়ে গেলো জীবনে। জীবন খুঁড়ে পেতে চাইলেন হীরকখণ্ড।

আজীবন ভালোবাসার কাঙাল এই মানুষটি নকশীকাঁথা থেকে তুলে এনেছেন কাকাতুয়া, আনবিক বোমার অপরপ্রান্তে দেখেছেন শস্যময় উজ্জ্বল প্রান্তর। তাঁর অন্ধকার যেমন রজনীভেদী এক দিক-নির্দেশনা, তেমনি আলোও সূর্যের এক জীবনদায়িনী উপমা। রক্তের প্রবাহকে হৃদয় থেকে মস্তিষ্কে সঞ্চালনের মাধ্যমে যেমন চৈতন্যের বিস্তার ঘটে, তেমনি কবিতাকে সার ধরে দাঁড় করিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে দিলে শুরু হয় জড়ের মনোক্রীড়া। চৈতন্য ও জড়ের দ্বৈরথে কবি কেবল খোঁজেন তাঁর লক্ষ্যবিন্দু। কবি রবিউল হুসাইনের এই লক্ষ্যবিন্দু কী? যুক্তির মধ্যে প্রতিযুক্তি স্থাপন করে যে কুহক সৃষ্টি হয় তাই বুঝি-বা তাঁর অভিধান।

৩

চকখড়ি-পেন্সিল-কলমের এক যৌথ অভিযানে রবিউল হুসাইনের কবিতা সহজপাঠ অতিক্রম করে। বারবার তাঁর কথা ফিরে আসে। একজন রবিউল হুসাইন কখনো রবিউল ভাই, আবার কখনো রবিদা হ’য়ে পুব-পশ্চিমে সমানভাবে আঙুল তোলেন এবং ঘ্রাণ শোঁকেন।

আমার চেনাজানার এই দীর্ঘ সময়ে, ছাত্রজীবন পার ক’রে কর্মজীবনে ধানমণ্ডি এলাকায়, মধ্যদুপুর-গভীর রাত ক’রেছি। তাঁর টেবিল ঘিরে ট্রেসিং পেপার এবং কবিতার পাণ্ডুলিপি রত ছিলো যুগল নৃত্যে। ‘পদাবলী’-র সেই মুগ্ধ কালটি ছিলো কতো সুনাম নিয়ে– শামসুর রাহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, অরণাভ সরকার, হায়াৎ সাইফ কেউ নেই। রবিউল ভাই, এখন কি আপনার কথা বলার জন্যই আমাকে অপেক্ষা ক’রতে হ’চ্ছে?

জাতীয় কবিতা পরিষদের সেই শুরু থেকে ভরসার শীর্ষে ছিলেন রবিউল হুসাইন। আরো কতো সংগঠন : বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, কচিকাঁচার মেলা... সবখানে ছিলো তাঁর ঠাঁই। স্থপতি হিশেবে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যেমন বিস্তৃত হয়েছেন, তেমনি ছিলেন ঊর্ধ্বমুখী। কবিতার পাশাপাশি হরেকরকমের লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন আমৃত্যু। একজন ভেতরের মানুষ নদীর নিয়মে প্রবাহিত হয়, আর বাইরে থাকে হাজারো বন্দর। স্পর্শ ক’রতে হয়, ভিড়তে হয়, আবার খুলতেও হয়। কিন্তু কবিকে যে হ’তে হয় সমুদ্র।

‘নদীরা প্রবাহিত হোক নদীর নিয়মে
মানুষ ও সমুদ্র এতে খুব খুশি হবে’

হাবীবুল্লাহ সিরাজী
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন

রবিউল হুসাইন পেশায় ছিলেন স্থপতি। কিন্তু পেশার গন্ডি পেরিয়ে তাঁর স্বাছন্দ বিচরন ছিল ছন্দের জগতে। কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা এবং আনন্দ দুটোই ছিল অপরিসীম। কবি হিসাবে তাঁর পরিচিতি সুবিদিত। প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট মতামত রেখে তিনি বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। সম্ভবতঃ নাগরিক সচেতনতা থেকে তার নিবন্ধ লিখন। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট ছিল প্রকাশের সরলতা। কথা বলা এবং লেখায় কখনো ঘোরপ্যাঁচ থাকতো না। একটি সরল ও সুন্দর মনের প্রকাশ ঘটতো তার লেখা এবং বলায়।

নাগরিক দায়িত্ব পালনে তাঁর বহুমুখী বিচরন লক্ষণীয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ট্রাষ্টের ট্রাষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশে স্থপতিদের শীর্ষ সংস্থার সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আয়োজিত সভা- সেমিনারে তাঁর বিচরন ছিল লক্ষ্য করার মত। টেলিভিশনের টক- শো তে ও তিনি নিয়মিতভাবে অংশ গ্রহন করতেন। তাঁর ব্যপক জনপ্রিয়তার মূল কারন ছিল কঠিন বিষয় সহজ করে বলার সক্ষমতা। তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেন না। তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তটি অকপটে প্রকাশ করতেন। বলা যায়, তিনি একজন স্বার্থক কথাশিল্পী।

রবিউল হুসাইন একজন একনিষ্ঠ শিশু সংগঠক ছিলেন। শিশুর মত সরল মনের অধিকারী এই মানুষটি শিশুদের সাথে মিশে যেতে পারতেন। তিনি প্রাচীন শিশু সংগঠন কেন্দ্রীয় কচি- কাঁচার মেলার সদস্য ও নির্বাহী ছিলেন দীর্ঘদিন। মৃত্যুর আগে তিনি ছিলেন কচি-কাঁচার মেলার সহ- সভাপতি।

কেন্দ্রীয় কচি- কাঁচার মেলার সাথে তাঁর সংশ্লিষ্ঠতার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। সেগুন বাগিচায় সরকার প্রদত্ত এক খন্ড জমির উপর মেলার কার্যালয় নির্মান হবে। রবিউল হুসাইনের প্রস্তাবিত প্লানটি গৃহীত হল। প্লান তৈরি করতে তিনি পারিশ্রমিক নেন নি। শিশুদের প্রতি স্নেহের প্রতীক হিসাবে তিনি এটি করেছিলেন। ঘটনাক্রমে প্লান অনুযায়ী স্থাপনাটি তৈরীর কাজ পর্যবেক্ষন ও তদারকীর দায়িত্ব ও তিনি পালন করেছিলেন। দশতলা ভবনের ভিত্তি সহ চারতলা তাঁর তত্ত্বাবধায়নে তৈরী হয়। ভবনটি লাল ও নীল রং-য়ে শোভিত। তিনি ব্যখ্যা দিতেন, লাল রং আনন্দের প্রতীক এবং নীল রং শৈশবের উচ্ছলতার। উল্লেখ্য, কচি- কাঁচার মেলার মনোগ্রাম ও লাল ও নীল রং শোভিত। ভবনটি নির্মানে ব্যতিক্রমি কারু-কাজ এবং ব্যতিক্রমি ডিজাইন দৃষ্ট হয়। সবই শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে।

কবি রবিউল হুসাইন কচি- কাঁচার মেলার সভা সমূহে আসার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মালায় নিয়মিত যোগ দিতেন। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করতেন। তাঁর বিষয় জ্ঞান যেমন ঈর্ষণীয় ছিল, তেমনি শিশু- শ্রোতাদের উপযোগী করে কথা বলার দক্ষতা ছিল তাঁর। শিশদের সামনে কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার কারনে তাঁর বক্তব্য সবসময়ে আকর্ষনীয় হতো। মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালীর সামাজিক- সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের উপর কথা বলতে পছন্দ করতেন। মনে হতো কথা গুলো হৃদয় থেকে উৎসারিত।

নিজের পরিকল্পিত এবং নির্মান করা ‘কচি- কাঁচা ভবন’ এর প্রতি বুঝি তাঁর প্রবল আকর্ষন ছিল। বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ বছরটিতে তাঁর কিছু ব্যতিক্রমী ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে মাঝে মাঝেই তিনি দুপুরে এসে সভাপতির কক্ষে রক্ষিত একটি ‘ইজি চেয়ারে’ একা একা ঘুমিয়ে থাকতেন। ঐ কক্ষে তখন কেউই থাকতো না। বিকেলে যখন মেলার সদস্য বৃন্দ আসা শুরু করতো, তিনি তখন এক কাঁপ কফি খেয়ে প্রস্থান করতেন। একদিন তিনি স্বেচ্ছায় এবং স্বউদ্যোগে একটি ছোট্ট চারতলা বিল্ডিংয়ের প্লান করে নিয়ে এসে বললেন, মেলা ভবনের উল্টো দিকে যে ছোট্ট টিনের ঘরটি রয়েছে, ঐ স্থলে তিনি এই প্রস্তাবিত বিল্ডিংটি করতে চান। সবার সঙ্গে আলোচনার পর তিনি প্লানটির কিছু সংশোধন করে সংশোধিত আরেকটা প্লান পেশ করলেন মৃত্যুর কিছু দিন আগে। তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন প্লানটি আমার টেবিলে পড়ে ছিল। উঠিয়ে রেখেছি ভবিষ্যতে যাতে বাস্তবায়ন করা যায়। হঠাৎ একদিন শুনলাম, রবিউল ভাই হাসপাতালে। আমি এবং মেলার সাধারণ সম্পাদক আলপনা চৌধুরী বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম। সেই হাসি- খুশি মুখ। যেন কিছুই হয় নাই। হাসপাতালে তাঁর ভাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘরের বাইরে এসে যা বললেন, তা ভয়াবহ। অসুখটা জেনেটিক। পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত। এই রোগের চিকিৎসা নাই। গুরুতর আকার ধারন করলে, প্রতিকার নাই। রবিউল ভাই আগেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। ভারতে ও দেখিয়েছেন। সব ডাক্তারেরই একমত। ভিতরে এসে রবিউল ভাইকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবারো কলকাতায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে সুযোগ আর হয়নি। সন্ধ্যায় আমরা ফিরে যাওয়ায় ৩৬ ঘন্টা পর তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আমরা দোয়া করি, তিনি যেন শান্তিতে থাকেন, আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
সভাপতি, কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা

নয়ন সমুখে তুমি নাই...

জাদুঘরের আয়োজনে ছিল তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি

রবিউল ভাই : কঠিন কালের সরল আশ্রয়

লিখবো? কিন্তু লিখে কি সে কথা বয়ান করা সম্ভব?! তবুও....

আমেনা খাতুন

.....

ভাবিনি এত জলদি রবিউল ভাইয়ের পরিত্যক্ত মুল্যবান জিনিস আমাদের আনতে হবে। কষ্টের, তবুও সুযোগটা ছাড়িনি। পাথর সরিয়ে মনি-মুক্তো এনেছি ঘরে, রবিদার আপন ঘরে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে! প্রজাপতির ডানায় উড়ে যিনি মর্ত্যলোকে মনি-মুক্তো ছড়িয়েছেন সেই মানিকচ্ছটা আমি আজ ঘরে তুলেছি!

হা বলছি কবি, স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর কথা। তাঁর কর্মস্থলে যেখানে মনের রঙিন প্রজাপতির ডানায় ভর করে তিনি সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য সব স্থাপনা আর রচনা করেছেন নিভৃত সব অনুভূতি, কবিতায়। তাই তো তাঁর দপ্তরের প্রবেশ দ্বারে শোভা পায় মৃত্তিকায় বসে পাখামেলা এক রঙিন প্রজাপতি! মানুষ সাধারণত উড়ে বেড়ানো যুগল প্রজাপতির ছবি সংগ্রহে রাখে। কিন্তু আপনি বুঝি মাটির আশ্রয়ে প্রজাপতির দেখা পেয়েছেন। পাশেই লিখেছেন 'আস্থার স্থপতি'!

রবিউল ভাই বেঁচে থাকতেও আমি গিয়েছি তাঁর দপ্তরে। মাথার উপর থেকে বামদিকে ঝুলে থাকা শালপাতা, ভাঙা চশমা, পথে কুড়িয়ে পাওয়া কোনো পিতার আদুরে খুকির পুতির চুড়ি, টুথব্রাশ এটা সেটা আরো কতো কি! আপনার বসার আসনের পেছন দিকে উপরে খালাম্মার ছবি এবং তার নিচেই ভাবীর (নূরজাহান বেগম টুকু) ছবি।

কিন্তু আজ! চেয়ারে আপনি নেই। দেয়ালে আপনার পাশেই আপনার মা আর ভাবির ছবি নেই। আছে শুধু আপনার কুড়িয়ে আনা মনি-মুক্তোর ঝোলা! বড্ড একা কিন্তু আপনার উপিস্থিতি জানান দিচ্ছে। ওর ভিতর থেকে এক শক্তি হাতছানি দেয় আমাকে,

৩১ মে ২০১৯ এ তোলা ছবি। রবিউল ভাই সেদিন অফিসে ছিলেন না। আমি ফোনে কথা বলে কিছু ছবি তুলে চলে আসি। ভাবিনি এত জলদি আবার যাবো। আর এরকম শূন্য হয়ে যাবে সব। সামান্য সময়ের ব্যবধানে দেয়ালে আগের কোনো ছবিই নেই!

কাছে ডাকে ইশারায়। ওর পিছনে রবিউল ভাই যে!

আমি কিন্তু আপনাদের তিনজনকে দেখতে পেয়েছি রবিউল ভাই। ছিলেন আপনি পুরোটা সময় ধরে। আপনি থাকবেন না তাই কি হয়! দুটো ছবি আমি দিই দেখেন তো কোনটি শক্তিশালী!

ভাইয়া, আমার স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। আপনি থাকলে কি বলতেন আমি জানি! 'এই তুই কদিনের জন্য কোনোখান থেকে ঘুরে আয় তো! এই বয়সে এরকম অসুখে ভুগছো, এটা হয় নাকি'। আমার এই ভাবনা যারা আপনার সান্নিধ্য পায়নি তাদের কাছে অমূলক মনে হতে পারে। তবে, অনেকেই যারা প্রশয়াশ্রিত হতে পেরেছিলাম তারা জানেন। আপনি আমাদের মতো সমাজের জটিল ধাঁধায় বেড়ে ওঠাদের কাছে কঠিন

আপনি চলে যাওয়ার পর ২৪ আগস্ট ২০২০-এ তোলা ছবি

কালের সরল আশ্রয়!

মনে পড়ছিলো খুব। মফিদুল ভাই যখন বললেন, কিভাবে ভালো করে রবিদার জিনিসপত্র আনা যায়, তুমি মন্টু ও নিতাকে দিয়ে ব্যবস্থা করো। তা কি করে হয় গো! মায়া পড়ে গেছে যেদিন প্রথম গিয়েছি। জীবন কদিনের? আপনার জীবনের অর্জনের ছিটেফোঁটাও যদি সংরক্ষণ করতে পারি, আর কি লাগে!? তাই তো একটি তুলনামূলক চিত্র এবং সংরক্ষণের আন্তরিক আয়োজনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেয়েছি। এভাবেই তো ইতিহাস সংরক্ষণের মাধ্যমে কীর্তিমানের কীর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ দেখাবে।

ঝোলাটা নিয়ে ভাবছিলাম, আহা বুঝি ফেলে দেবে একে। আমিই বা নিয়ে কোথায় রাখবো! জাদুঘরের সাথে এর সম্পৃক্ততা আছে না নেই?! ঠিক তখনই সহকর্মী মন্টুবাবু সরকার আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে চমকে দিয়ে বললো। আপু উনি বলছেন রবিউল ভাই নাকি অসুস্থ অবস্থায় বলেছেন এটা জাদুঘরে দিতে। আমি অবাক হই, কে বলেছে, সত্যি নাকি? তখন স্থপতি শফিউদ্দিন আহমেদ বললেন হা, রবিউল ভাই আমাকে বলেছেন এটা আপনাদের দিতে। আমি তো অবাক! আপ্লুত হয়ে বললাম, ভাইয়া এই বিষয়ে আপনাকে রবিউল ভাই কি বলেছেন তা আপনি একটু লিখে দিবেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে দিবো।

মুক্তিযোদ্ধা-কবি-স্থপতি ও মানুষ এই চার মিলে যে রবিউল হুসাইন-কে আমি দেখেছি তা বুঝতে হলে অনেক গভীর থেকে চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। এ দিন-মাস-বছরের কাজ নয়। প্রয়োজন যুগ-যুগান্তর। নতুন প্রজন্মের কাছে এই মানবিক মানুষকে তুলে ধরার খুব প্রয়োজন আজ।

আপনার সাথে স্বাধীনভাবে খোলা মনে কাজ করার যে অসাধারণ উপলব্ধি আমার হয়েছে তা এই সমাজে বিরল। আমি আপনার কীর্তি আপনার দেখানো পথেই সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

২৪-২৫ আগস্ট ২০২০ রবিউল হুসাইনের দপ্তর থেকে সংগৃহীত তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপি, দেশি-বিদেশি পত্রিকায় ছাপা নিবন্ধ, বিশেষ উপায়ে করা আত্মপ্রতিকৃতি, লিটল ম্যাগাজিন, নিজের লেখা কবিতার বইসহ অন্যদের লেখা নানা বিষয়ে বই, ব্যবহৃত সামগ্রীসহ বহুবিধ স্মারকের কিছু নমুনাচিত্র:

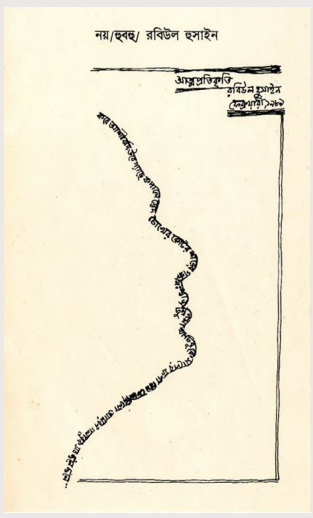

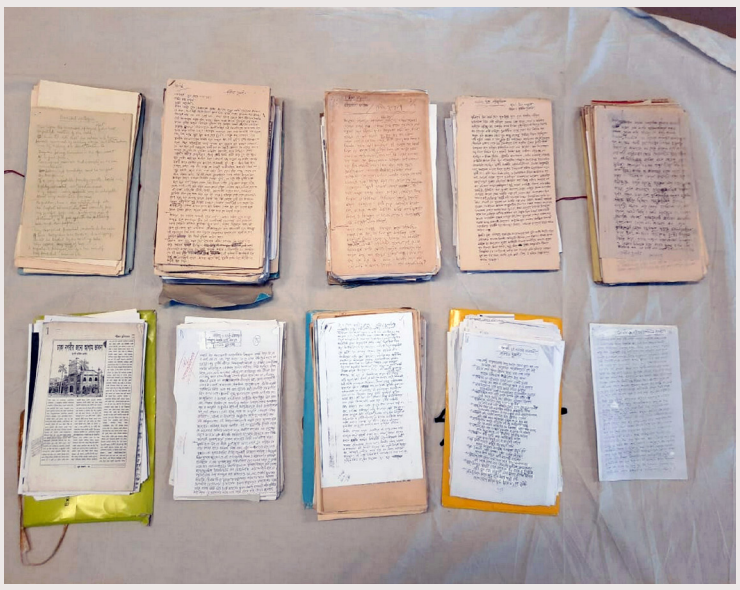

অসীমের অনন্ত নিবিড়ে

তারিক সুজাত

কবি ও সংস্কৃতি কর্মী

'ধীরে ধীরে ডুবে যাই বিমর্ষ হলাহলে বিষ নয়, মধু নয়/যাপিত জীবনের অনবদ্য অস্তিত্বে, অসীমের অনন্ত নিবিড়ে'। প্রিয় অগ্রজ কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন নিজের একটি কবিতায় এই অনবদ্য অস্তিত্বের কথা বলে গেছেন। কেমন ছিলো তাঁর যাপিত জীবন? আমাদের মাঝে এমন কয়জন আছেন যিনি নিজেকে পরার্থে এভাবে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন! বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের বহুবিধ শাখায় ছিলো তাঁর অবাধ বিচরণ। বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট, জাতীয় কবিতা পরিষদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, সার্ক দেশভুক্ত স্থপতি প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলাসহ অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কোথায়ও সভাপতি, কোথায়ও সহ-সভাপতি, আবার কোথায়ওবা ট্রাস্টি সদস্য। কখনও কখনও পর্যায়ক্রমে একাধিক মেয়াদে। এই সংগঠনগুলোর শীর্ষ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করলেও তিনি প্রাণচঞ্চলতায় সতত ক্রিয়াশীল ছিলেন সাধারণ কর্মীর মতোই।

১৯৮৭-৮৮ সালের কথা, যখন স্বৈরাচারী শাসনের অগ্নিগর্ভ থেকে বাংলাদেশের প্রগতিশীল কবিরা 'শৃঙ্খল মুক্তির ডাক দিয়ে' জাতীয় কবিতা উৎসবের সূচনা করেন– সেই দিনগুলোতে যে কয়জন এই প্রতিবাদী আয়োজনে মূল শক্তি জুগিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সে সময় আমাদের কবিদের খুব বেশিজনের গাড়ি ছিলো না। প্রথামাফিক কবিতা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতো ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ সকালে। শুরুর কয়েক বছর উদ্বোধক ছিলেন জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামাল। রবিউল ভাই এবং ভাবি প্রতি উৎসবের সকালে সুফিয়া খালাম্মাকে ধানমন্ডির বাসা থেকে নিয়ে আসতেন। এরপর বছরের পর বছর কবি শামসুর রাহমানকেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার ভার নিজেই নিয়েছিলেন রবিউল ভাই। মনে হয় এই তো সেদিন– গাড়ি থেকে নামার পর রাহমান ভাইয়ের পরিধেয় শাল ঠিক করে দিচ্ছেন রবিউল ভাই!

১৯৮৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কবিতা উৎসব মঞ্চে সন্ধ্যার একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। সে সময় আমরা টিএসসি'র তিনতলায় কাউন্সিল অধিবেশনে। হঠাৎ খবর আসে শিল্পী কামরুল অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেদিনের ঘটনাপ্রবাহ আমরা কম বেশি সবাই জানি। মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্বে পটুয়া কামরুল হাসানের শেষ রেখাচিত্র 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' কিভাবে পোস্টার হয়ে দেশময় প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিলো। ঠিক তার পরের বছর টিএসসি'র তিনতলার সেই কক্ষে আয়োজন করা হয়েছিলো কামরুল হাসানের চিত্র প্রদর্শনী। সে বছর উৎসবের আহ্বায়ক ছিলেন শিশুসাহিত্যিক-সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সেই সংকট দিনে ফয়েজ ভাই এবং রবিউল ভাইয়ের অনুরোধে শিল্পসংগ্রাহক ও শিল্পীর পরিবারের সংগ্রহ থেকে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছিলো। স্বল্পসময়ের উদ্যোগে ও সীমিত পরিসরে আয়োজিত হলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমাদের প্রতিবাদী শিল্প আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে পড়ে স্বৈরাচার কবলিত দুঃসময়ে তরুণ কবিদের ওপর দায়িত্ব পড়েছিলো সারারাত জেগে প্রদর্শনীর শিল্পকর্মগুলো পাহারা দেওয়ার। তখনও রবিউল ভাই ছিলেন আমাদের সহায়– তাঁর গাড়িতে করেই ছবিগুলো আনা-নেয়া করতাম।

কবি-শিল্পী-স্থপতি-লেখক-সাংবাদিক-শিশুসংগঠকদের মধ্যে এক অদৃশ্য মেলবন্ধন তৈরি করেছিলেন রবিউল ভাই। কয়েকটি প্রজন্মের সৃষ্টিশীল মানুষদের সহজাত সুষমায় ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তিনি। এই যোগসূত্র রচনায় তাঁর ভূমিকা হিসাব করে মেলানো যাবে না। কিন্তু তিনি তা মেলাতে পেরেছিলেন। 'সংগতি' কবিতায় কবি অমিয় চক্রবর্তী যেভাবে বলেছিলেন, 'তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে/যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে/মেলাবেন।' বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পে পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। নিজের স্থাপত্যকর্মেও দেশীয় ঐতিহ্য, ফর্ম ও ইটের ব্যবহার এক অনবদ্য শৈল্পিক মাত্রায় পৌঁছেছে। মিরপুরের জল্লাদখানা সমাধিসৌধ কিংবা সারাদেশব্যাপী গণহত্যার স্থানসমূহে স্থাপিত স্মৃতিফলকের নকশায় তিনি সহজতার সৌন্দর্যকে নিপুণ আঙ্গিকে প্রয়োগ করেছেন। কবিতায় তিনি শুরু থেকেই ভিন্ন পথের পথিক হওয়া সত্ত্বেও স্বকীয়তা নিয়ে উজ্জ্বল। তরুণ বয়সে 'না' গোষ্ঠীর সাহিত্য-শিল্প আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং 'না' পত্রিকার সম্পাদক। প্রথাবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কখনও তিনি উচ্চকণ্ঠ নন। কবিতা অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর হাত থেকে আমরা পেয়েছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরম সুহৃদ অ্যালেন গিনস্‌বার্গের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হাউল'-এর অনবদ্য অনুবাদ। বেশ কিছু ভিন্নমাত্রিক অসাধারণ গল্প ছাড়াও তিনি লিখেছেন কিশোর উপযোগী উপন্যাস– 'কুয়াশায় ঘরে ফেরা' ও 'দুর্দান্ত'। এছাড়া সম্পাদনা করেছেন 'কবিতায় ঢাকা' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য সংকলন। যার দ্বিতীয় পর্বের কাজটি হাতে নিয়েছিলেন। শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিষয়ক তাঁর বিশাল রচনাসম্ভারের একটি বড় অংশ এখনও গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়নি। এই দেশপ্রেমী বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল মানুষটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছেন। অবহেলাও কম পাননি। এই করোনা ক্রান্তিকালেও তাঁর বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, স্থাপত্য নকশা ও সংগৃহীত বই সরিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁরই গড়া স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানের স্মৃতি বিজড়িত কক্ষ থেকে। আমরা কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারিনি। তাঁর পরিবার অসহায়ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি, বিদায়বেলায় সদস্য সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত রবিউল হুসাইন ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের সকলের প্রিয়। আটজন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি সদস্যদের রবিউল ভাই স্বভাবসুলভ রসিকতাপূর্ণ সরলতায় বলতেন– 'সাত ভাই চম্পা'। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে যুগ যুগ ধরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই সম্মিলিত প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

প্রিয় অগ্রজ রবিউল ভাইয়ের প্রতি তাঁরই লেখা কবিতার চরণ দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই–

'ভুলেও ভুল ক' রে ভোলা কি যায় তারে'
'অবশেষে টের পায় মানুষেরা
জীবিতদের জীবন কী গ্লানিময় হাহাকারে ভরা
তার চেয়ে অনেক ভালো চিরদিন কবরের ঘরে শুয়ে থাকা'

বিশেষ চরিত্রের একজন মানুষ

রবিউল ভাইয়ের সঙ্গে কবে কখন প্রথম আমার দেখা হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই, তবে হবে তা দু'দশক আগেরই কোন একটা সময়ে। রবিউল ভাই শুধু যে একজন স্থপতিই ছিলেন এমন নয়। তিনি একজন উন্নতমানের কবি এবং তাঁর একটি শিল্পীস্বত্তা ছিল। অমায়িক, সদালাপী, সৃজনশীল একজন ভদ্রলোক ছিলেন রবিউল ভাই। যখনই কোথাও দেখা হত, সহসাই তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যেত না। অন্যূন এক ঘণ্টা সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলে কোথা দিয়ে যে শেষ হয়ে যেত তা নিজেই বুঝতে পারতাম না। তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু আমাকে ভাবতেন তাঁর একজন পরম সুহৃদ ও বন্ধু। বন্ধু কথাটিতে আমার আপত্তি ছিল, তাই বলতাম আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে আমাকে বন্ধু সম্বোধন করলে মানুষ আড়ালে আমার নিন্দা করবে। তাচ্ছিল্যভরেই তা উড়িয়ে দিতেন রবিউল ভাই। তিনি বলতেন, বয়সের পার্থক্যটা তেমন কিছুই না। মন এবং চিন্তার সমসাময়িকতাই দুজন মানুষকে বন্ধুতে পরিণত করে। রবিউল ভাই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছেন এমন কথা তাঁর কোন পরিচিত মানুষই বলতে পারবেন না। তাঁকে শুধু আমরা দেখতে পাই না, তাঁর সঙ্গে গল্প করা হয়ে উঠে না। এটা তাঁর অনুপস্থিতি, যে অনুপস্থিতিটা প্রায়শই মনের গভীর কোনে একটি বেদনার অনুভব দেয়।

একজন স্থপতি একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং একজন হৃদয়গ্রাহী মানুষ, এমন গুনের সমন্বয় খুব কম মানুষের ভেতরই পরিলক্ষিত হয়। তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের একজন সম্মানিত সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। সব সময়ই লক্ষ করেছি নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকে রবিউল ভাই ছিলেন অসাধারণ। মিটিংয়ের বেশ কিছু আগেই যখন কোনো সদস্যই উপস্থিত হয়নি তখন রবিউল ভাই এসে উপস্থিত। ট্রাস্টের মাননীয় সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিউল ভাইকে ভীষণ স্নেহের চোখে দেখতেন কিন্তু রবিউল ভাই কখনোই তাঁর নিজের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সাহায্য বা অনুকম্পা প্রার্থনা করেননি বরং অন্য অনেকের অনেক তদ্বিবির তিনি প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করতেন। তাদের কারো কারো কাজ হয়েছে আবার কারো কারো হয়নি কিন্তু কখনোই রবিউল ভাই তাঁর নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা করেননি। তিনি যখন কোনো মানুষ সম্পর্কে আলাপ করতেন তখন তাঁকে উচ্চ আসনে বসিয়ে তার একটি ভূমিকা দিতেন। এই ছিলেন রবিউল ভাই। একদিন আমাদের ট্রাস্টের মিটিং রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত চলল। সবাই চলে যাওয়ার পরে মাননীয় সভাপতিকে বিদায় জানিয়ে আমিও রওনা দিলাম। ৩২নং সড়কের মাথায় এসে দেখলাম রবিউল ভাই হেঁটে চলেছেন। আমি গাড়ী থেকে নেমে রবিউল ভাইয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমাকে বললেন না কেন, আপনি হেঁটে হেঁটে রওনা দিলেন যে। উনি হেঁসে দিয়ে বললেন বাসা পর্যন্ত এইতো এইটুকুই পথ, হেঁটে গেলে শরীরটা ভালো থাকে। আমি বললাম, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েই গেছে তখন আপনি হেঁটে যেতে পারবেন না, গাড়ীতে উঠুন আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব। রবিউল ভাই বার বার অস্বীকার করতে লাগলেন, হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল যে কারো কাছ থেকেই তিনি কোনো সহযোগিতা নেবেন না। শেষ পর্যন্ত হাত ধরে রবিউল ভাইকে গাড়ীতে তুললাম। এই ছিলেন রবিউল ভাই, যিনি অতি সাধারণ, সাদামাটা একজন মানুষ।

একদিন ট্রাস্টের মিটিং শেষ করে দেখলাম রবিউল ভাই বসে আছেন, আমাকে দেখতেই হেঁসে দিয়ে বললেন আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি, আপনাকে এইবারের কচিকাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। রবিউল ভাই কচিকাঁচার মেলার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন জানতাম। হেঁসে দিয়ে বললাম, হঠাৎ আমাকে প্রধান অতিথি কেন? প্রধান অতিথি হওয়ার যোগ্যতা কি আমার আছে? তিনিও হেঁসে দিয়ে বললেন, আমরা যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তারা বুঝে শুনেই নিয়েছি। এই কচিকাঁচার মেলাকে বঙ্গবন্ধু খুব ভালোবাসতেন, তো সেখানে আপনি প্রধান অতিথি হবেন না তো হবে কে? আপনি একজন কবি, লেখক, গ্রন্থকার, বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের সদস্য সচিব, যোগ্যতায় আপনি কম কিসে? রবিউল ভাইয়ের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল। তিনি আমার হাতে কার্ড দিয়ে বললেন, খবরদার মিস হয়না যেন। তিনি হয়তো সবাইকেই তাঁর চাইতে যোগ্যতর ভাবতেন। এইসব ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরে এলাম। তিন চারদিন পরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে ৩৭/এ, সেগুন বাগিচা রোডে কচিকাঁচার মেলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। রবিউল ভাই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি উনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিব্রতবোধ করতে লাগলাম। গাড়ী থেকে নামতেই রবিউল ভাই আমাকে নিয়ে সভাকক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। এমনই বিনয়ী ছিলেন রবিউল ভাই।

আরো একটি ঘটনা আমার খুব বেশী করে আজ তাঁর স্মৃতিচারণ করার সময়ে মনে পড়ছে, ঘটনাটি ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকের। হঠাৎ করেই খবর পেলাম রবিউল ভাই খুবই অসুস্থ এবং তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি হয়েছেন। খবরটা পেয়েই আমি রবিউল ভাইকে ফোন করলাম। বললাম আপনি হাসপাতলে ভর্তি আর আমাকে জানাননি। তিনি হেসে বললেন ভাই অসুস্থতো সবাই হয় তার জন্য কাউকে ব্যতিব্যস্ত করা কি ঠিক? আমি বললাম, সন্ধ্যার পরে আমি আসছি। তিনি বললেন আবার কষ্ট করে আপনি আসবেন, আসার প্রয়োজন নেই। আমি বললাম, আপনি ফোনটা ছাড়ুনতো আমি আসছি। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমি বঙ্গবন্ধুতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রবিউল ভাইয়ের কক্ষে তিনি আর তাঁর এক ভাই ছিলেন। আমি যেতেই রবিউল ভাই শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। হেঁসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি বললাম, আপনি উঠছেন কেন, শুয়ে পড়ুন। তিনি বসেপড়ে বললেন, এখন একটু ভালো বোধ করছি। হাসপাতালে যাবার আগেই আমি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কনক কান্তি বড়ুয়াকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওখানে রবিউল ভাই ভর্তি আছেন, আপনি জানেন কি? তিনি বললেন, কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে দেখে এলাম। আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ফোন করে জানানো হয়েছে। আগামীকাল সকালেই একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করব। তারপর ওনার প্রকৃত চিকিৎসা শুরু হবে। রবিউল ভাই নানা বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা শুরু করলেন। আমি বারবার বলতে থাকলাম, আপনি অসুস্থ, আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলব না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ওনার যে ভাই ওখানে বসে ছিলেন রবিউল ভাইয়ের ইশারায় তিনি আমি যাওয়ার পর পরই ওখান থেকে উঠে গিয়েছিলেন। দেখলাম তিনি আসছেন এবং তার পিছনে একজন বেয়ারার হাতে ট্রেতে করে নিয়ে আসা চা আর বিস্কিট। আমি হৈ হৈ করে উঠলাম, বললাম রবিউল ভাই এসব কি? আপনি গুরুতর অসুস্থ, এসময় মেহমানদারি করার সময় নয়। রবিউল ভাই বললেন, মেহমানদারি কৈ করলাম, শুধু তো দু'কাপ চা। আমরা দু'জনে খাব। তাতে আমারও একটু চা খাওয়া হবে।

রবিউল ভাইয়ের কক্ষ থেকে উঠে আসবার সময় হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত ৯:৩০ বাজে। সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছিলাম ৫/৭ মিনিটের মধ্যে রবিউল ভাইকে দেখে বেরিয়ে আসব। কিন্তু কোথা দিয়ে যে আড়াই ঘণ্টা সময় রবিউল ভাই নানা আলাপ আলোচনায় অতিবাহিত করেছেন তা বুঝতেই পারিনি। তারপরে আর তাড়াতাড়ি সময়ে আমি হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করতাম না। তাই ৪/৫ দিন পর আরেকবার তাঁকে দেখতে গেলাম। প্রচন্ড অসুস্থ ছিলেন রবিউল ভাই। ডাক্তার আমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছিল বেশি সময় তাঁর কাছে থাকবেন না। আমাকে দেখেই রবিউল ভাই উঠে বসার চেষ্টা করলেন। আমি ধরে তাঁকে আবার শুইয়ে দিলাম। সেদিন প্রায় ১৫ মিনিট সময় আমি রবিউল ভাইয়ের পাশে ছিলাম। এরপর থেকে আর আমি হাসপাতালে যাইনি। সেদিন ছিল ২৬ নভেম্বর, ২০১৯। ঘুম থেকে উঠতেই ট্রাস্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন শওকত আমাকে ফোন করলেন, জানালেন রবিউল ভাই আর নেই। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে বাসায় আনা হবে কিনা এবং কোথায় দাফন করা হবে? ক্যাপ্টেন শওকত বললেন, বাসায় আনা হবে এবং বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে। আমি সময়টা জেনে নিলাম। শওকত আরো জানালেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রবিউল সাহেবকে দেখতে আসবেন।

এক কাপ চা খেয়েই রবিউল ভাইয়ের বাসার দিকে রওনা দিলাম, গিয়ে দেখি লাশবাহী গাড়িটি এসে গেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন বলে সমস্ত রাস্তাগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রবিউল ভাই তখনও ফ্রিজিং ভ্যানে সাদা কাফনে আবৃত, শুধু তাঁর মুখটি খোলা রাখা আছে। ভ্যানের বাইরে থেকেই রবিউল ভাইকে জীবনের শেষবারের মতো দেখলাম। আর কোনদিনও তাঁকে দেখব না, তিনি চলে গেছেন অজানা ভবিষ্যতের রাজ্যে। কিছুক্ষণ পরেই বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেখানে এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে গাড়ি থেকে অভ্যর্থনা করে ফ্রিজিং ভ্যানের কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি নিরবে কিছুক্ষণ রবিউল ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিষন্ন মুখে, হয়তো রবিউল ভাইয়ের বিভিন্ন স্মৃতি তাঁর মানষপটে ভেসে উঠছিল। তারপর তিনি ফিরলেন, হেঁটে এলেন রবিউল ভাইয়ের ডাক্তাররা যেখানে অপেক্ষা করছিল সেখানে। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রবিউল ভাইকে যারা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছিলেন তাঁরা এসে ঘটনা প্রবাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করলেন। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর গাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন। আমি তাঁর পিছনে পিছনে চলছিলাম, তিনি একটু থেমে আমাকে বললেন, রবিউল ভাই আমাদের বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁর চিকিৎকালীন খরচ এবং দাফন কাফনসহ অন্যান্য খরচ যেন ট্রাস্ট থেকে নির্বাহ করা হয়। তিনি ছিলেন ভীষণ গম্ভীর এবং বিষন্ন, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল রবিউল ভাইয়ের মৃত্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভীষণভাবে ব্যথিত হয়েছেন। আমি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন, সেখানে অবশ্য আমাদের ট্রাস্টেরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একমাত্র ডাক্তার ব্যতিত আর কারো সঙ্গেই কোনো কথা বললেন না। গাড়িটি বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমি দেখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। আমাকে ট্রাস্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন শওকত এবং আমাদের ট্রাস্টের সদস্য মেজর জেনারেল হাফিজ মল্লিক বললেন, আপনি নিজেও অসুস্থ, মাত্র কয়েক মাস আগেই আপনার অপারেশন হয়েছে, সুতরাং আপনি বাসায় চলে যান। আমি যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল রবিউল ভাইয়ের সঙ্গে অজস্র স্মৃতির কথা, তাঁর মুখ বার বার ভেসে উঠছিল আমার মনে। ভাবছিলাম আমরা এমন বিশেষ চরিত্রের একজন মানুষকে আজ হারালাম যে স্থান বাকী জীবনে হয়তো আর পূর্ণ হওয়ার নয়। মনে মনে রবিউল ভাইকে আমার জীবনের শেষ সালাম জানিয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। মনে মনে বললাম, রবিউল ভাই আপনাকে সালাম। চিরকাল মনে থাকবে আপনার কথা। রবিউল ভাইয়ের দেহ এবং স্মৃতি পিছনে ফেলে আমি আমার বাসার দিকে রওনা দিলাম। সন্ধ্যার পরে ট্রাস্ট থেকে ফোন করে রবিউল ভাইয়ের দাফনের বিষদ বিবরণ দেয়া হল। ফোন রেখে ভাবলাম এমন একজন মানুষ সমাজে সত্যিই দুর্লভ। এমন নির্ভেজাল সদালাপী নিরহংকার একজন মানুষ সমাজে সত্যিই দুর্লভ। তাঁর মতো একজন বিনয়ী সহিত্য প্রেমিক আর আমাদের মাঝে আসবে কিনা জানি না।

রবিউল ভাই যেখানেই থাকুন না কেন তিনি যেন চিরশান্তিতে থাকেন, তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি এ লেখা শেষ করছি। বিদায় রবিউল ভাই, চির বিদায়।

শেখ হাফিজুর রহমান
সদস্য সচিব
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

স্থাপত্যের জীবন কিংবা জীবনের কবি

আমাদের জন্য কেউ একজন ছিলেন কিন্তু এখন নেই। এই আছে এবং নেই এর মাঝে শূন্যতার যে ব্যপ্তি, কষ্টের যে তীব্রতা তা অনুভবে নিতে হলে যার জন্য হৃদয়ের এই ক্ষরণ তাকে চিনতে হয়, অনুভবে নিতে হয়।

রবিউল হুসাইন। জন্ম ৩১শে জানুয়ারি ১৯৪৩, মৃত্যু ২৬শে নভেম্বর ২০১৯। ৭৬ বছর এর এক জীবন, মানুষের জন্য ভালোবাসা এবং মানুষের ভালোবাসা নিয়ে এক জীবন। জন্মস্থান ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলা, পিতা- তোফাজ্জল হোসেন, মাতা- বেগম লুৎফুন্নেছা, পাঁচ ভাই ও চার বোনের সবার বড়ো, মিয়াভাই, আমাদের প্রিয় রবিদা। বসবাস কুষ্টিয়া শহরে, স্কুলের পড়াশুনা "কুষ্টিয়া মুসলিম হাইস্কুল", কলেজ "কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ"। ১৯৬২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার আগেই পিতার মৃত্যু। অভিভাবক শূন্যতায় জীবনে একটি ধাক্কা, তারপরেও অনমনীয় দৃঢ়তায় ১৯৬২ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য অনুষদে ভর্তি হতে আসেন।

স্থাপত্য বিভাগের প্রধান, স্থপতি রিচার্ড ই ভ্রুম্যান। রবিউল হুসাইন-এর সাথে আলোচনায় তিনি জানতে পারেন তিনি ফ্রাংক লয়েড রাইটকে নিয়ে একটি লেখা পড়েছেন এবং সেটাই তাকে স্থাপত্যে পড়তে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সফস্বল থেকে আসা একজন, তার মুখে ফ্রাংক লয়েড রাইট এর কথা শুনে ভ্রুম্যান মুগ্ধ, রবিউল হুসাইন স্থাপত্যের ছাত্র হলেন। স্কলারশীপ-এর টাকা আর খণ্ডকালীন চাকরি এ দুয়ের বেশীরভাগ কুষ্টিয়া যেতো সংসারের খরচ-এর জন্য, বাকী টাকায় কষ্টের হোস্টেল জীবন। ঐ সময়কালে রাজনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সহপাঠীদের নিয়ে বের করেন কবিতার ম্যাগাজিন, "না"। সব শৃঙ্খলা, নিয়ম কানুন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী "না" ঐ সময়কালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা ম্যাগাজিন। ১৯৬৮ সাল, স্থাপত্যে স্নাতক ডিগি অর্জন শেষে রবিউল হুসাইন যোগদেন স্থাপত্য আচার্য্য মাজহারুল ইসলাম-এর "বাস্তুকলাবিদ"-এ। ঐ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, চিটাগং ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস, স্ট্যানলি টাইগার ম্যানের সাথে যৌথভাবে দেশের ৫টি পলিটেকনিক ইনসটিটিউট। ইসলাম সাবের প্রিয় সহকারী ছিলেন রবিউল হুসাইন।

একাত্তুরের যুদ্ধ। স্বাধীন একটি দেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামী একজন তার "বাস্তুকলাবিদ" এর জন্য নতুন কোনো প্রকল্প পাননা। ঐ সময়ে স্থপতি মাজহারুল ইসলাম- এর অংশীদার পুর প্রকৌশলী শেখ মো: শহীদুল্লাহ, "শহীদউল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস" প্রতিষ্ঠা করেন। রবিউল হুসাইন একজন পরিচালক হিসেবে এখানে যোগদেন, শুরু হয় রবিউল হুসাইনের আরেক সংগ্রামী জীবন। এ সময়কালে অনেক ভালো স্থাপত্য সৃষ্টির সাথে অনেক কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, শিশু সাহিত্য, স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ নানা ধরনের সাহিত্যকর্মে তিনি ব্যস্ত থাকেন। তার সাহিত্য ও স্থাপত্য কর্মের জন্য বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিত।

- কবিতা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমি এওয়ার্ড
- স্থপতি হিসেবে সামগ্রিক কার্যক্রমের জন্য ২০১৩ সালে বার্জার লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড
- পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান বাস্থই কর্তৃক ২০১৬ সালে বাস্থই গোল্ডমেডেল
- শিল্প ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৮ সালে একুশে পদক

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশর স্থাপত্য ও সাহিত্য কিংবা স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট সচেতন কোনো প্লাটফর্ম, সকল স্থানে রবিউল হুসাইন অনস্বীকার্য। এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার পরিচয় এবং প্রিয়তা লক্ষনীয়। বাস্থই-এর জন্মলগ্ন কমিটিতে সভাপতি মাজহারুল ইসলামের সাথে তিনি কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন। বাস্থই-এর চারবার সভাপতি ছিলেন তিনি। সার্চ-এর সভাপতি, আর্কএশিয়ার সহ-সভাপতি, সিএএ-এর সহ-সভাপতি, আর্কএশিয়া ফেলোশিপ কমিটির কনভেনর হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংগ্রাহক, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ট্রাষ্টি, বঙ্গবন্ধ ট্রাষ্টি-এর সদস্য, ঢাকা নগর জাদুঘরের সদস্য, কচিকাঁচার মেলা, ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি, কবিতা পরিষদ এমনি বহু সংগঠনের সাথে তার সম্পৃক্ততা।

পেশার জন্য নিবেদিত তিনি, সমাজের জন্য কর্মবীর। সংসারের দায়িত্ব ও তিনি পালন করেছেন নিষ্ঠার সাথে। তার ভাই বোনেরা সব প্রতিষ্ঠিত আজ। থেকে যাই শুধু আমরা এবং ছেলে রবীন। রবিউল ভাই ঝিনুকের মতো। মুক্তা জন্ম দিয়ে আমাদের মুক্তার মালা উপহার দিয়ে নিজেকে বিলীন করেছেন তিনি। তার কষ্টকর সংগ্রামী জীবন তার কবিতা, স্থাপত্য এব শৈল্পিক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়ে স্মরণ করিয়ে রাখে যে মুক্তা নিয়ে আজ আমরা উদ্ভাসিত তার ধারক একজন ঝিনুকসম রবিউল হুসাইন।

স্থপতি কাজী নাসির
সাবেক প্রধান স্থপতি, বাংলাদেশ সরকার
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট

আমার রবিউল ভাই

'মানুষ, মানুষকে অপছন্দ করে, বদনামও করে'- দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে অনেক খুঁজেও এমন একজন পেলাম না যিনি অপছন্দ করেন তাঁকে। এ মানুষটিই আমাদের প্রিয় স্থপতি, কবি, দেশ বিনির্মাণের সংগঠক স্থপতি রবিউল হুসাইন। বুয়েটে ভর্তির পর থেকেই তিনি পরিণত হয়েছিলেন, 'প্রিয় মানুষে'। দুই ক্লাস ওপরে ছিলেন অথচ কিছুদিনের মাঝেই হয়ে গেলেন আমার অতি আপনজন। ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা ও কবিতা সংকলন 'না' প্রকাশের মাধ্যমে তিনি আলোড়িত

করেন তৎকালীন যুব সমাজকে। পরবর্তীতে দেখেছি স্বনামখ্যাত কৃতি স্থপতি হয়েও, কবি রবিউল হুসাইনের কাব্য সিক্ত করেছে অগণিত পাঠকের হৃদয় গত কয়েক দশক জুড়ে।

স্বাধীনতার পূর্বেই স্থপতি হয়ে বেরিয়েছিলেন বুয়েট থেকে, এরপরেও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল প্রিয় বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এবং কর্ম প্রশ্নাতীত। একাত্তরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদানসহ বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বদেশ পুনঃনির্মাণে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেশজ লাল ইটের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যকর্ম দেশ-বিদেশে বিপুলভাবে হয়েছে প্রশংসিত। নতুন দেশে তিনি সুদৃঢ় করেছিলেন 'স্থাপত্য' পেশাকে। পেশাগত জীবনে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল, 'স্থাপত্যগুরু' স্থপতি মাজহারুল ইসলামের 'বাস্তকলাবিদ' প্রতিষ্ঠানে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত ধানমণ্ডি-৩২ সড়কের ঐতিহাসিক বাড়িটিকে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে' রূপান্তরের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের রবিউল ভাই। সময়ের সাথে সাথে এ বাড়িটি আজ, শোকে-দুঃখে, প্রাপ্তির আনন্দে শ্রদ্ধা নিবেদনের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস ও বিশ্বের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি ও তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' স্থাপন ও নির্মাণে প্রধান ভূমিকা পালন করেন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাষ্টিদের অন্যতম স্থপতি রবিউল হুসাইন। অপরদিকে আমরা তাঁকে পেয়েছি শিশু-কিশোর সংগঠন 'কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা'র যুগ্ম পরিচালক হিসেবে অনন্য ভূমিকায়।

তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্রের ট্রাস্টি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির নির্বাহী পরিষদ সদস্য, শিশু কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার যুগ্ম পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ট্রাস্টের নির্বাহী সদস্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য, বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য, সহযোগী সদস্য কলকাতা আন্তর্জাতিক শিল্প- সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফাউণ্ডেশন, সভাপতি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রিটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা, সদস্য আই এ বি, সদস্য রাজউক, সাবেক সভাপতি স্থপতি অ্যালামনাই পরিষদ, সাবেক সভাপতি (দুবার) জাতীয় কবিতা পরিষদ, সাবেক সভাপতি (চারবার) বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি)সহ বহু প্রতিষ্ঠানের নানা পদ অলংকৃত করেছেন। বহুমাত্রিক মানুষ রবিউল ভাই স্থপতি, কবি, শিল্প-সমালোচক, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে ঈর্ষনীয় সাফল্য পেয়েছেন। সাফল্যের প্রতিফলন হিসেবেই একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরষ্কার, আইএবি, স্বর্ণপদকসহ অসংখ্য সম্মাননায় তাঁকে ভূষিত হতে দেখেছি আমরা।

'বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট' (আইএবি)-এর চারবারের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন স্থপতি রবিউল হুসাইন। তাঁর সভাপতিত্ব কালেই সহ-সভাপতি হিসেবে আইএবি-এর কার্যক্রমের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। দেশের স্থাপত্যের উন্নয়ন চেষ্টায় রবিউল ভাই জড়িত ছিলেন আন্তর্জাতিক স্থাপত্য পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সাথে। মৃত্যু পরবর্তীকালে, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় স্মৃতিচারণ করেছেন আন্তর্জাতিক স্থাপত্য পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাঁর জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে ছিল যে, মৃত্যু সংবাদ প্রচারের অব্যবহিত পরেই তাঁর ধানমণ্ডি ৪নং সড়কের নিবাসে উপস্থিত হয়ে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের স্থাপত্য ও স্থপতিদের নিয়ে তাঁর আশাবাদ অবশ্যই আমাদের স্মরণ করতে হবে, নবীন-প্রবীণ স্থাপত্যবিদদের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্থাপত্যশিল্প। এঁদের হাত ধরেই একদিন বদলে যাবে ধূলি-মলিন দেশের চেহারা। আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মিশেলে তৈরি হবে নতুন আবাস। সেখানে আবারও পাখির ডাক শুনে ঘুম ভাঙবে, জানালা খুলতেই ঘর ভরে যাবে কামিনী ফুলের গন্ধে। সে দিন আর বেশি দূরে নয়।

একে একে চলে যাচ্ছেন আমাদের আলোকিত মানুষগুলো, যাঁদের ছায়ায় আমরা স্বাপ্নিক হতে শিখেছি। তাঁর শুন্যস্থান পূরণীয় নয়। আরও বেশ অনেকদিন বড্ড প্রয়োজন ছিল আপনাকে। জীবনের বহু ঘাত প্রতিঘাত পার করে এসেও তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন প্রেরণার অখন্ড উৎস হয়েই।

তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি প্রতিনিয়ত।

ভালো থাকবেন কবি, ভালো থাকবেন শ্রদ্ধা-ভালবাসার রবিউল ভাই।

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি)

নয়ন সমুখে তুমি নাই...

জাদুঘরের আয়োজনে ছিল তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি

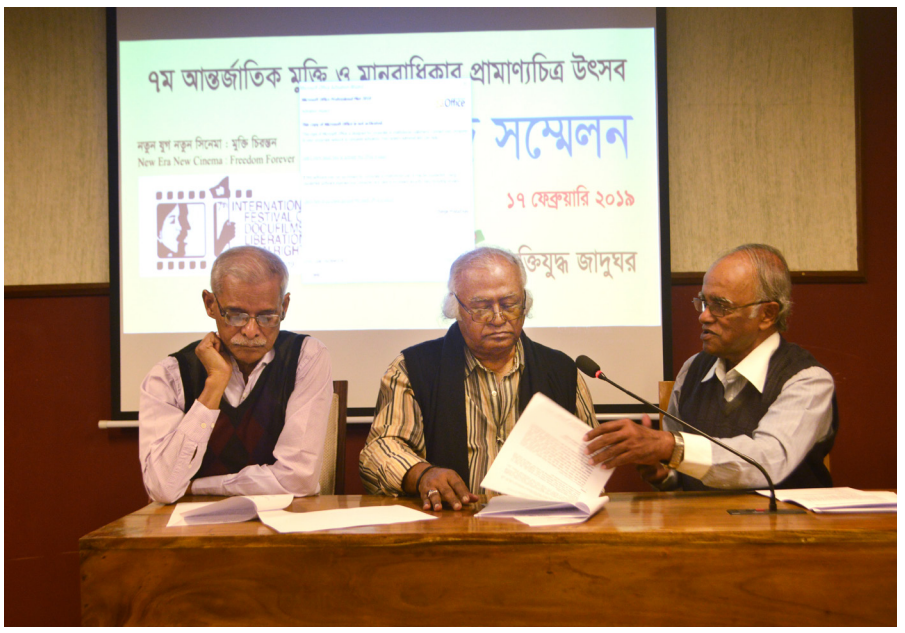

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official